Vol. I. No. -2&3. April - September 2011

CHETANA LAHAR - Quarterly Bengali magazine of DAF
(Democratic Action Forum of Dalits, Women & Minorit

চেতনা লহর একটি ত্রৈমাসিক বাংলা পত্রিকা

- যতদিন, সংরক্ষণ ততদিন
- শ্রেণী সংগ্রাম-শ্রেণী ঐক্য বজায় রেখে এস.সি., এস.টি, ও.বি.সি, সংখ্যালঘু অধিকার আন্দোলন গড়ে তুলুন
- সাম্রাজ্যবাদ, ব্রাহ্মণ্যবাদের কবল থেকে ভারতবাসীদের মুক্ত করুন।
- উন্নয়নের বাহানায় অমানবিক উচ্ছেদ বন্ধ হোক
- বিদেশী পুঁজি বাজেয়াপ্ত করে ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের বিকাশ ঘটান

DAFODWAM thinks that India is a de facto upper caste Hindu [illegible] Brahminism derived from MANU SANGHITA is still the guiding [illegible] of the Indian ruling classes. Untill the abolition of the caste system [illegible] crimination based on gender and community there is no chance [illegible] victory of class struggle, in whatever form.

Besides taking programmes of rights of Dalits, Women and [illegible] (Religious and Linguistics) DAFODWAM is in the area of publi[illegible] books on concerned subjects in different languages.

For Correspondence :

ananta acharya
DAFODWAM
30/2 N.P. Road, Kolkata – 700055,
West Bengal, India
Ph:-(0)9331858854

Email- dafodwam@gmail.com
anantaacharya1949@gmail.com
mukta_angan2002@rediffmail.com

Exchange Price - 40/-

Edited and Published by ananta acharya on behalf of DAFODWAM,
30/2 N.P. Rd. Kolkata - 700055 and Printed at Sakthar Mudran - 4 D.P.S. [illegible]

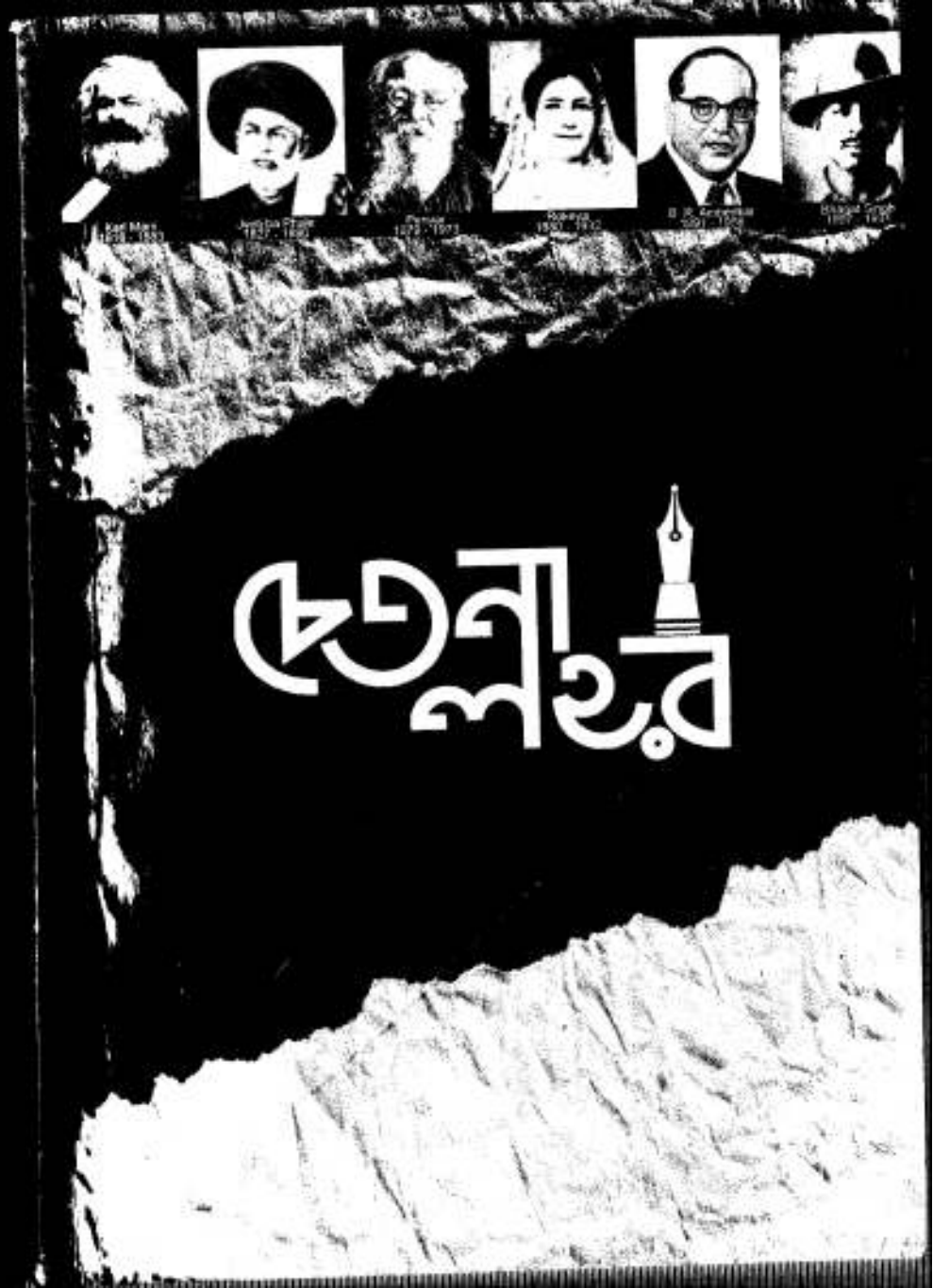

আমাদের কথা

মনুবাদের মরুভূমিতে শত দলিত পুষ্প প্রস্ফুটিত হোক

ডাফোড্যামের (ডেমোক্রেটিক অ্যাকসন্ ফোরাম অফ দলিতস ওমেন এন্ড মাইনরিটিস) বাংলা ভাষার মুখপত্র চেতনা লহরের ২য় ও ৩য় সংখ্যা যুক্তভাবে প্রকাশিত হল। যোগাযোগের দুর্বলতার কারণে চাহিদা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বাংলাভাষী বহু পাঠকের কাছে পত্রিকার প্রথম সংখ্যা পৌঁছতে পারেনি। আমরা ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সতর্ক হব। বেশ কিছু পাঠকের প্রতিক্রিয়া আমরা অন্য পাঠকদের সাথে ভাগ করে নিতে চাই। পাঠকদের বহুলাংশ মনে করেন যে ভারতে জাতিভেদ ব্যবস্থা, বর্ণহিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও লিংগ বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মুক্তমন অথচ উচ্চবর্ণ উপাধিধারীরা বা/এবং মার্কসবাদী দর্শনে বিশ্বাসীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন, নিচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও নেবেন। যদিও এ বিষয়ে নানা শিবিরে নানা মত আছে যার অনেকাংশ সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট। একাংশ মনে করেন দলিত অধিকার প্রতিষ্ঠার, সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধানে বা পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে কেবলমাত্র প্রান্তেবাসিন্দারাই অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্ব দেবেন। আর একাংশ মনে করেন, এই ধরনের অধিকার আন্দোলনকে গুরুত্ব দিলে তা বহু আলোচিত শ্রেণী সংগ্রামের মর্মবস্তুকে দুর্বল করবে। আমরা দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করি যে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্রময় ভারতীয় সমাজ কাঠামোর কারণেই মনুবাদ-ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিটি বহিঃপ্রকাশের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত লড়াইয়ের মাধ্যমেই একটি তুলনামূলক গণতান্ত্রিক সমাজের প্রাথমিক স্তরে পৌঁছনো যায়, যা আমূল সমাজ পরিবর্তনের পথে যাত্রা সহায়ক।

সহানুভূতি (Sympathy) বনাম সমানুভূতি (Empathy) বিতর্ক চলুক। কিন্তু কার্ল মার্কস, ফুলে, পেরিয়ার, বেগম রোকেয়া, আম্বেদকর, ভগৎ সিংদের ন্যায় চিন্তকদের অস্বীকার করে ভারতে মানবমুক্তির স্বপ্ন দেখাও মূঢ়তা।

ব্রাহ্মণ্যবাদী আধিপত্যের বিরুদ্ধে শত চিন্তা প্রতিযোগিতায় নামুক

এসো মুক্ত কর, মুক্ত কর এই অন্ধকারের দ্বার

চেতনা লহর

CLASS CASTE RELATIONS
MARXIST APPROACH

DAFODWAM PUBLICATION

For Collection :-

Mail : dafodwam @gmail.com
or
Call : (0) 9331858854

যাঁদের রচনাবলী অবশ্যপাঠ্য

কার্ল মার্কস, জ্যোতি বা ফুলে, রামস্বামী পেরিয়ার,
বেগম রোকেয়া, আম্বেদকর, ভগৎ সিং।

যাঁদের রচনাবলী পাঠককে মুক্তমনা হ'তে সহায়তা করবে

অক্ষয় কুমার দত্ত, কোসাম্বী, রাহুল সাংকৃত্যায়ন,
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়,সুকুমারী ভট্টাচার্য,
আরজ আলি মাতুব্বর,রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, আহমেদ শরিফ,
আশিষ লাহিড়ী, ভবানীপ্রসাদ সাহু।

সুপ্রসিদ্ধ চিন্তাশিল্পী নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় এবার 'বোলশেভিকি'র বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন - 'আত্ম শক্তির' পৃষ্ঠায় তিনি ধরে নিয়েছেন - বোলশেভিকবাদ existing order -এর বিরুদ্ধে। এবং তাই তিনি নিজেকে ওর বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছেন।

গোড়াতেই বলে রাখি, বোলশেভিকের পক্ষসমর্থনের জন্য আমি কলম ধরিনি। কেননা বোলশেভিজম্ অনেক বড়ো বড়ো আক্রমণ সয়েও টিকে আছে, আশা করি নলিনীবাবুর ধাক্কাও সে সামলে উঠবে। আমি চিন্তিত হয়ে পড়েছি গীতা-উপনিষদ ইত্যাদি আমাদের ঘরোয়া সাবেক জিনিসদের রক্ষা করতে। কারণ নলিনীবাবু যেভাবে গীতা-উপনিষদের মতো অতি পুরানো মাপকাঠি দিয়ে বোলশেভিকির অতি আধুনিক ও অত্যন্ত বিরাট বিশ্বরূপ মাপতে লেগেছেন, তাতে আমার আশঙ্কা হয়, মরচে পড়া কাঠিগুলি না মড়কে যায়। মনে হয়েছে তার মানদন্ডের প্রাণদন্ড দিতেই যেন তিনি মরীয়া।

বোলশেভিকির বিরুদ্ধে নলিনীবাবুর প্রধান অভিযোগ এই যে, উহা নাস্তিক্য-বুদ্ধি, গীতার কথায়, তামসজ্ঞান প্রসূত। কেননা, ' মানুষ -যে দেবতা, মানুষ -যে ব্রহ্ম, মানুষ যে ভগবান স্বয়ং - এই সকল কথা তাহার কাছে যে কেবল অবাস্তব এমন নয়, ইহাদিগকে সে মনে করে মানুষ মারা বিষ মন্ত্র।' তাহলে বোঝা যাচ্ছে, নলিনীবাবুর মতে, মানুষ যে দেবতা, মানুষ যে ব্রহ্ম, মানুষ যে ভগবান স্বয়ং - এই সকল 'অতিবাস্তব সত্য' কথায় দৃঢ় বিশ্বাসই হচ্ছে আধ্যাত্ম বিজ্ঞান; এবং বোলশেভিকরা যদি মনে করে মানুষ কেবলমাত্র মানুষ, তার বেশি কিছু নয়, এমনকি দেবতা, ব্রহ্ম ও ভগবান - তিনটার একটাও সে নয় তাহলে সেটা তাদের নাস্তিক্য -বুদ্ধির রীতিমতো বিজ্ঞাপন। পৃথিবীতে non-sense এর proportion খুব বেশি - তার মধ্যে বাস করে sense of proportion রাখাটা যে ঘোরতর তামসজ্ঞানের পরিচয় - একথায় নলিনীবাবুর সঙ্গে আমি একেবারে একমত।

গীতা - উপনিষদের বাক্য আমরা নির্বিবাদে ও নির্বিচারে মেনে নিই, কেননা ওসব প্রাচীন বলেই সত্য এবং সম্ভবতঃ সত্য বলেই প্রাচীন। কিন্তু এও তো মিথ্যে নয় যে, আর সব কিছুর মতো সত্যেরও জন্ম, যৌবন ও বার্ধক্যের কাল আসে - সেও যথানিয়মে নবীন সত্যকে স্থান ছেড়ে দিয়ে শেষে প্রাচীন পুঁথির মিউজিয়মে - সনাতন কবরখানায় - দেহরক্ষা করে। সত্যসত্যই যদি কোনোকালে মানুষ ভগবানরূপে দলে দলে বিচরণ করে থাকে, এখন আর তাদের সশরীরে দেখতে পাওয়া যায় না; কাজেই নলিনীবাবুর কথিত সত্য এখন আর জীবন্ত হয়ে নেই, পুঁথির পাতায় নির্বিকল্প আশ্রয় গ্রহণ করেচে। সুতরাং দুঃখ যতই সূক্ষ্ম হোক, যা নেই - তা নিয়ে, যা আছে তার সঙ্গে লড়াই করাটা অসাধারণ আস্তিক্য-বুদ্ধির পরিচয় হতে পারে, কিন্তু এই ধরনের রেষারেষির শেষাশেষি প্রায়ই খুব সুবিধায় দাঁড়ায় না! পরশুরাম বড়ো লড়ায়ে ছিলেন, ব্রহ্মাস্ত্র ছিলো তাঁর; কিন্তু গত পরশুরামকে নিয়ে আজ আর কোনো আরাম নেই!

আমি বলতে চাই, শ্রীকৃষ্ণের গীতার চেয়ে কার্ল মার্কসের গীতা বড়ো, কেননা এই গীতা আজকের মানুষের জীবনে সত্য হয়ে উঠেচে - পুরোনো গীতার কোনো বচন দিয়েই এই নূতন গীতার সৃষ্টিশক্তির পরিমাপ করা যায় না। সব্যসাচীর জ্ঞাতি বিরোধের কুরুক্ষেত্রের চেয়ে লেনিনের শ্রেণী সংগ্রামের বিশ্বক্ষেত্র ঢের বড়ো - আদর্শের দিক দিয়ে, তত্ত্বের দিক দিয়ে ও সম্ভাবনার দিক দিয়ে। জগতের দুঃখে বুদ্ধদেব কেঁদে আকুল হয়ে কঠোর বাস্তবের হাত থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলেন, কিন্তু লেনিনকে আমি বুদ্ধের চেয়েও বড়ো বলবো এই জন্যে যে, তিনি তাঁর কঠোরতর সাধনায়, সবলতর বাহুর জোরে এই কঠিন বাস্তবকে ভেঙে গুঁড়িয়ে, গুঁড়ির থেকে নতুন করে গড়তে পেরেছেন। এই ভাঙা গড়ায় যদি 'অভিজাত বর্ণত্রয়ের বিলোপ' ঘটে থাকে, তবে তার একান্ত প্রয়োজন ছিল বলেই ঘটেছে। তার জন্যে দুঃখ করে লাভ নেই।

নলিনীবাবুর তাঁর প্রবন্ধের এক জায়গায় বলেছেন - অন্তরের ভাবে ও ধর্মে তাহারা (বোলশেভিকরা) শূদ্রই : ... নতুন শূদ্রকে সৃষ্টি করিয়া বোলশেভিক তাহার নূতন সমাজের গঠন করিতে চাহিতেছে। কিন্তু এই চেষ্টা হইতেছে

যাহাকে বলে, পিরামিডকে তাহার চূড়ার উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার দুশ্চেষ্টা! ফলতঃ নূতন সমাজের সৃষ্টি হতে পারে একমাত্র শূদ্রের দ্বারাই। আর তাদের গঠন সৃষ্টির দরকার নেই, দরকার শুধু নূতন দৃষ্টির। পৃথিবীর আদি সমাজ, আদি সভ্যতা কৃষকের লাঙ্গলের ফালেই গড়ে উঠেছিল; আজ পর্যন্ত সভ্যতার যা খাঁটি সোনা তা উদ্ধার করছে শ্রমিকরাই, তাতে পালিশ লাগাচ্ছে নলিনীবাবুর 'অভিজাত বর্ণত্রয়' এবং গিল্টিও চালাচ্ছে তারাই। কিন্তু নলিনীবাবুদের দলগত মতিগতি এমনই জলবৎ তরল যে, এই গিল্টি কন্‌সেপ্টটা কখনোই তাঁদের মনে কোনো আঁচড় কাটে না।

রাশিয়ার কথা ছেড়েই দিই - রাসলীলায় ভারী কড়াকড়ি - কিন্তু আমেরিকার নূতন সমাজ কাদের সৃষ্টি? ইউরোপ থেকে যেসব শূদ্রের দল আমেরিকায় নির্বাসের পত্তন করতে গিয়েছিল, তাদের। আদিযুগের আর্যাবর্তেরও সেই একই ইতিহাস। সমাজসৃষ্টির গোড়ায় থাকে শূদ্রের শক্তি - পরে সেই সমাজের শোষণ, শাসন এবং নিছক শোভাবর্ধনের জন্য যথাক্রমে বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের উদয় হতে থাকে। সমাজের মতো বিরাট সৃষ্টি একমাত্র শূদ্রের দ্বারাই সম্ভব। ব্রাহ্মণের দ্বারা হতে পারে দু'-একটা সঙ্ঘ, আশ্রম বা আড্ডা - বড়ো জোর এক আধ নৈমিষারণ্য বা পণ্ডিচেরি মার্কা আধুনিক ব্যাসকাশি।

নলিনীবাবুর ভাবখানা অনেকটা এইরকম: আধুনিক শূদ্রদের স্পর্ধা দ্যাখো, তারা এসব তত্ত্বকথা মানতেই চায় না! হোক না কেন এই 'শূদ্রবর্ণা পৃথিবীতে' তাদের সংখ্যাই সাড়ে পনেরো আনা তবু তো তারা সেই 'কৃষক আর মজুর'। অভিজাত অর্ধ-আনাকে হেঁটে ফেলে এতদিন এই 'অভিজাতদের' সুশাসনে ছিল হয়ে কেমন সুখে কালাতিপাত তারা করেছিল - তার বিনিময়ে কিনা এই! তার ভাষায় বলতে গেলে নেহাৎ তারা ছোটলোক!

অথচ সনাতন আমাদের ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মচিন্তার সঙ্গে অর্থচিন্তার কী অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন - একধারে যেমন উপনিষদ গীতা, অপরদিকে তেমনি স্মৃতিসংহিতা: একদিকে যেমন বড়ো বড়ো তত্ত্ব, অপরদিকে তেমনি জাতিনির্বিশেষে অন্নপ্রাশন থেকে শুরু করে বেচারার শ্রাদ্ধ পর্যন্ত নিত্য-নৈমিত্তিক নানান আপদ, এমনকি বহুকাল আগে যতম্ হয়ে গেলেও তার পুত্রপৌত্রাদিক্রমে

মড়া মাথার ওপর বংশানুক্রম জিজিয়া; দুর্গ্রহক্রমে এই ভূ-গ্রহে জন্মাবার ও মরবার পাপের শাস্ত্রমতো প্রায়শ্চিত্ত - সেই যে আমাদের ছিল ভালো! বোলশেভিক শূদ্ররা নিজের দেশের ব্রাহ্মণদের তো লোপ করেইছে; আমাদের ব্রাহ্মণদের এই সব চিরকেলে ব্যবসা, বিনা পুঁজির ফলাও কারবার - এসবও লোপাট করবে নাকি? তাহলেই তো গেছি!

তারপর ক্ষত্রিয়। কেমন তারা দেশে দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ ও অশান্তি বাধিয়ে রাখত - তাদের নব নব কুরুক্ষেত্র পৃথিবীতে শূদ্রাধিক্যের কত বড়ো অমোঘ ঔষধ ছিল, আর তাদেরই কিনা বিলোপ করা! বেচারা বৈশ্যদের যা দুর্গতি করেচে, মনে করলেও কান্না পায়। অর্থ অনর্থের মূল -শূদ্রদের সেই অর্থ থেকে রক্ষা করবার জন্যে মারাত্মক অর্থভার কষ্ট করে নিজেরা এতদিন বহন করেচে; অবশ্য ভারমুক্ত হয়ে তারা বেঁচে গেল - কিন্তু এইভাবে বাঁচানো ? সম্পূর্ণ তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বে - এর চেয়ে না বাঁচানোই যে ভালো ছিল। বৈশ্যরা শোষণ করবে, ক্ষত্রিয়রা শাসন করবে, আর ব্রাহ্মণেরা রকমফের করে দুটোই করবে - এই অপূর্ব সহযোগ ও সমবায়ের মধ্যে যে অভিজাত সমাজের 'প্রাণ' ছিল, সেখানে 'দ্বন্দ্ব ও সন্দেহ' আমদানি করে শূদ্রজাতরা কী সর্বনাশই না করলো!

মস্কোর কথা থাকুক, পন্ডিচেরির দিকেই তাকাই এখন। সেখানকার ' নূতন ব্রাহ্মণেরা' চিন্ময়লোকে 'বীজবপনে' যেমন অত্যধিক সময় নিচ্ছেন তাতে অজন্মার ভয় একেবারেই করিনে! রাশিয়ায় ধর্মরাজ্য স্থাপন করতে পারুন আর নাই পারুন অন্ততঃ এই দেবভূমি ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের ব্রহ্মস্পর্শ যদি কায়েম রাখতে পারেন, তাহলেও হাঁপ ছেড়ে বাঁচি! অন্তত- আমরা তো রক্ষে পাই। আমরা অসহায়ভাবে তাঁদেরই মুখ চেয়ে রইলুম। বেটার লেট্ দ্যান নেভার।

মস্কো বনাম পন্ডিচেরী (বসুমতি) বইটির শীর্ষরচনা থেকে সংকলিত এবং বানান অপরিবর্তিত

আমাদের দেশ যেসব বিষয় লইয়া গর্ববোধ করে তাহাদের মধ্যে জাতিভেদ একটা। অন্যান্য দেশে জাতিভেদের অর্থ — ভাষার পার্থক্য, বর্ণের পার্থক্য। আমাদের দেশে একই ভাষাভাষী একই বর্ণবিশিষ্ট লোক ভিন্ন ভিন্ন জাতির হইয়া থাকে। এই অদ্ভুত জাতিভেদ ভারতের বাহিরে অন্য কোথাও দেখা যায় না। এই ভারতীয় জাতিভেদের উদ্দেশ্য কী? ধর্ম এবং আচার পালনে যাহারা বিশ্বাস করে তাহারা ভিন্ন জাতির সহিত একত্রে আহার করিতে পারিবে না, তাহাদের হাতের ছোঁয়া জলও পান করিতে পারিবে না; বিবাহ তো বহুদূরের কথা। মুসলমান এবং খৃষ্টানও এই ছোঁয়াছুয়ির রোগ হইতে বাঁচিতে পারে নাই, তবে বিবাহ ব্যাপারে। জাতিভেদেরই উগ্র রূপ অস্পৃশ্যতা আমাদের দেশের একটা ভয়াবহ সমস্যা। অনেকের গায়ে ছোঁয়া লাগিলে স্নান করা প্রয়োজন মনে করে। অনেক স্থলে অস্পৃশ্যদের পথ দিয়া যাইবার অধিকার নাই। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থগুলি অন্যায়ের আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক কারণ হাজির করে। গান্ধীজী অস্পৃশ্যতা দূর করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু একই সাথে শাস্ত্র এবং বেদের দোহাই লইয়া চলিতে চাহিতেন। ইহা তো কর্দমের সাহায্যে কর্দম পরিষ্কার করা।

অন্যান্য দেশের লোকজনের পক্ষে অস্পৃশ্যতা কী বুঝিতে পারা কতটা কঠিন তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি। ১৯৩২ সনে বৃটিশ সরকার যখন সাম্প্রদায়িক পাঁচোয়ারা দেয় আর গান্ধীজী তাহার জন্য আমরণ অনশন আরম্ভ করেন তখন আমি লন্ডনে ছিলাম। অনেক দিন পরে ভারতবর্ষ সম্পর্কে এই রোমহর্ষক সংবাদ ইংলন্ডের পত্রিকাগুলিতে ছাপা হয়। তাহারা বড় বড় অক্ষরে ইহা ছাপে। যেসকল দেশে অস্পৃশ্যতা নাই তথাকার অধিবাসীরা ঐ সম্বন্ধে কী জানিবে? লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত একটি চৈনিক ছাত্র আমার নিকট আসে এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করে অস্পৃশ্যতা কী? আমি তাহাকে খানিকটা বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। সে জিজ্ঞাসা করিল, ইহা কি কোন ছোঁয়াচে অসুখ অথবা কুষ্ঠের ন্যায় কোন ব্যাধি যাহাতে লোকে রোগগ্রস্তকে স্পর্শ করিতে চাহে না? আমি বলিলাম সে আমাদের মতো সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান। হ্যাঁ, অধিকাংশেরই আর্থিক অবস্থা হীন। আমি

আধ ঘন্টারও অধিককাল তাহাকে অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বুঝিলাম যে আমার বন্ধুটি কিছু বুঝিতে পারিতেছে না। তখন আমি আমেরিকার নিগ্রোদের উদাহরণ দিয়া বুঝাইতে আরম্ভ করিলাম। এবার আমি খানিকটা বুঝাইতে সক্ষম হইলেও সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না যে একই বর্ণ এবং চেহারার মধ্যে অস্পৃশ্যতা কী করিয়া থাকিতে পারে?

বিগত হাজার বৎসরের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে বোঝা যাইবে যে ভারতবাসীর বিদেশীর দ্বারা পদদলিত হইবার প্রধান কারণ জাতিভেদ। জাতিভেদ কেবল মানুষকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশেই বিভক্ত করে না - একই সাথে সকলের মনে উচ্চ নীচের মনোভাব সৃষ্টি করে। ব্রাহ্মণ মনে করে আমি শ্রেষ্ঠ, ক্ষত্রিয় হীন। ক্ষত্রিয় মনে করে আমি উচ্চ, চামার নীচ। চামার মনে করে আমি উচ্চ, মেথর নীচ। মেথরও নিজেকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কাহাকেও সম্ভবত নীচ মনে করিয়া থাকিবে। ক্ষত্রিয় হইলেই মনে করিবেন না যে তাহারা সকলেই সমান। তাহাদের মধ্যে অসংখ্য জাতিভেদ আছে। তাহারা কুলীনকন্যা বিবাহ করিয়া নিজেকে উচ্চ প্রমাণিত করিবার জন্য নিজেদের জাতির মধ্যেই অনেক লড়াই বিবাদ করিয়াছে এবং দেশের সৈনিক শক্তির বহু অপচয় ঘটাইয়াছে। এই জাতিভেদের ফলে দেশরক্ষার ভার একটি জাতির উপর ন্যস্ত করা হয়। যেখানে দেশরক্ষার সমগ্র দেশের আত্মাহুতির প্রস্তুতি প্রয়োজন সেখানে একটি জাতির স্কন্ধে সম্পূর্ণ দায়িত্ব চাপাইয়া দেওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। ক্ষত্রিয় জাতি সৈনিকবৃত্তিতে আপনাকে অযোগ্য প্রমাণ করে নাই। তথাপি কেবল দেশরক্ষার কথাই নহে, সেকালে সাথে সাথেই রাজশক্তির প্রলোভনও তাহাদের অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং ইহার ফলে তাহারা ক্রমাগত নিজেদের মধ্যে লড়াই করিতে থাকে। তাহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল বিশেষ বিশেষ রাজবংশকে রক্ষা করা। রাজবংশের পরস্পরের মধ্যে রাজশক্তিকে দখল করিবার জন্য রেষারেষি দেশের সৈনিকশক্তিকে অনেক ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়াছিল এবং তাহারা একত্রিত হইয়া বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারে নাই। কিন্তু যদি জাতিভেদ না থাকিত তাহা হইলে অন্য দেশগুলির মতো সমগ্র ভারতবাসীও দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিত। জাতীয় ঐক্যের ফলে বহু ক্ষুদ্র দেশও দীর্ঘদিন পর্যন্ত স্বাধীনতা বজায় রাখিতে সমর্থ হয়। এই বিশাল ভারত যখন ছাব্বিশ শতাব্দীতে পরাধীন হয়, লন্ডার মতো ক্ষুদ্র দ্বীপ — যাহার জনসংখ্যা এখনো পঞ্চাশ লক্ষের কাছাকাছি

১৮১৪ সন পর্যন্ত পরাধীন হয় নাই। ব্রহ্মদেশ তো তাহার পরেও ষাট বৎসর পর্যন্ত স্বাধীন ছিল। ভারতবর্ষের প্রতিবেশী এই ক্ষুদ্র দেশগুলি কী করিয়া এতদিন পর্যন্ত নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হয়? আজও আফগানিস্তানের ন্যায় দেশ কী করিয়া স্বাধীন? এই কারণে যে সেখানে জাতি এত অংশে বিভক্ত নহে। সেখানে উচ্চ-নীচের মনোভাব এরূপ ভাবে প্রসারিত হয় নাই এবং দেশের সকলেই স্বাধীনতার জন্য ক্ষত্রিয় হইয়া কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া লড়াই করিতে পারে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে কয়েকবার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের সুযোগ আসিয়াছিল। কিন্তু আমাদের প্রাচীন অভ্যাসই ইহা সম্ভব হইতে দেয় নাই। শের-শাহ-বংশের রাজমন্ত্রী বীর হেমচন্দ্র(হেমু) শুধু চাহিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি একবার দিল্লির সিংহাসনেও আরোহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজপুতরা বৈশ্য বলিয়া তাহার বিরোধিতা করে। দূরদর্শী সম্রাট আকবর ভারতবর্ষে একটি জাতি স্থাপন করিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বপ্ন স্বপ্নই রহিয়া গেল। তাঁহার পর হিন্দু মুসলমান কখনো জাতীয় একতাকে সুনজরে দেখিতে চাহিল না। ইংরাজদিগের হস্তে যাইবার পূর্বে ভারতের সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্য মারাঠিদিগের করায়ত্ত ছিল। কিন্তু তাহাও ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের প্রশ্নে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। আমাদের পরাজয়ের সমগ্র ইতিহাসই বলে যে আমরা জাতিভেদের ফলেই এই অবস্থায় পৌঁছিয়াছি।

অর্ধশতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া কংগ্রেস জাতীয় ঐক্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছে। যে সামান্য ঐক্য স্থাপনে সে সমর্থ হইয়াছে, তাহার ফল আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি: দুইটি প্রদেশ ব্যতীত অবশিষ্ট সকল প্রদেশের শাসনরজ্জু আজ কংগ্রেসের হস্তে। (সিন্ধু প্রদেশের সরকারও কংগ্রেসকে স্বীকার করে।) কিন্তু আমরা কংগ্রেসের নেতাদের কি মনোভাব দেখিতে পাইতেছি?

কংগ্রেসের বড় বড় নেতারা যেখানে একদিকে জাতীয় ঐক্যের রবে স্বর্গ মর্ত মুখরিত করিতেছেন তখনই অপরদিকে 'ভারতীয় সংস্কৃতি' আর 'হিন্দুধর্মের প্রেমে' তিনি কাহারো অপেক্ষা সামান্য পিছাইয়া পড়িতে রাজি নহেন। আর এই কারণেই সে জাতিভেদের সংকীর্ণ গন্ডির সামান্য বাহিরে যাইতেও সাহস পায় না। কায়স্থ কংগ্রেস নেতা কায়স্থ জাতির ঐক্য এবং অগ্রসরতা সম্বন্ধে খুব সচেতন। যখন তাহার জন্ম মৃত্যু বিবাহ সকলই নিজের জাতির মধ্যেই হইবে তখন তাহার পৃথিবী তো কায়স্থদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যোগ্য অযোগ্যতার বিচার

না করিয়া নিজেদের কায়স্থ আত্মীয়স্বজন ও তাহাদের পরিবারের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। যে কোন চাকুরি দিতেই হইবে। এইরূপ জাতিপ্রীতির জন্য কাজ করিতে গিয়া কোন অন্যায়ই অন্যায় নয়, কোন পাপই পাপ নয়। ভূমিহার কংগ্রেস নেতার যখন ভূমিহার জাতির বাহিরে কোন সম্পর্ক নাই, তখন ভূমিহার জাতির বাহিরের পৃথিবীকে কী করিয়া নিজের বলিয়া মনে করিবে? আমাদের নেতাদের মধ্যে জাতিভেদের এই ধারণা কীরূপ প্রবল তাহা আমরা সকলেই জানি। এই মনোভাবের জন্য আমাদের সর্বজনীন জীবন অত্যন্ত কলুষিত, রাষ্ট্রীয় শক্তিও বলিষ্ঠ হইতে পারে না। রাজনৈতিক দল তো প্রথম হইতেই ছিল,ইহাতে জাতিভেদ আসিয়া অবস্থাকে আরো ভয়ংকর করিয়া তুলিয়াছে। এই জাতিভেদ কেবল হিন্দুদিগের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে নহে, উপরন্তু মুসলমান এবং অন্যান্যরা ইহার কবল হইতে রেহাই পায় নাই। মুসলমানদের উচ্চবর্ণের নেতাদের স্বার্থ এবং অদূরদর্শিতার জন্য সেখানে 'মোমিন' আর 'মোমিন নয়' এই প্রশ্ন তোলা হইয়াছে। যদিও মুসলমান নবাব এবং ধনী ব্যবসায়ীরা চিরদিন এই চেষ্টাই করিয়াছে যে খাজনা এবং গো-হত্যার প্রশ্ন তুলিয়া নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে পৃথক করিয়া রাখা যায়। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে এই প্রয়াস বিফল হইবে। জাতীয় নেতাদের দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী হওয়া প্রয়োজন। তাহাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিস্তৃত হইলে তবেই তাহারা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকদূর পর্যন্ত চিন্তা করিতে পারিবেন। কিন্তু তাহাদের এই মনোবৃত্তি নিন্দনীয়। বিহার প্রদেশের কংগ্রেস নেতা এবং মন্ত্রীদের মধ্যে এই জাতিবিচার অত্যন্ত ঘৃণিতরূপ ধারণ করিয়াছে। মন্ত্রীরা স্বজাতীয় সদস্যদের নিজের আওতায় রাখিয়া সেই দৃষ্টি দ্বারাই কাজ করেন। অবস্থা এই পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে যে যদি এই দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন পরিবর্তন না আসে তাহা হইলে সর্বজনীন জীবনের নোংরামি চরম সীমায় পৌঁছিবে।

যাহারা ধনী অথবা ধনী হইতে আগ্রহশীল, তাহারাই এইসকল নোংরামি ছড়াইয়াছে। সকলেরই চিন্তা অর্থ সঞ্চয় অথবা উহার রক্ষণাবেক্ষণ। দরিদ্র এবং আপন শ্রমলব্ধ অর্থে যাহারা জীবন যাপন করে তাহাদের ক্ষতিই সর্বাধিক। কিন্তু হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া জাতিভেদের প্রতি জনসাধারণের মধ্যে যে ধারণা সৃষ্টি হইয়াছে তাহাদিগকে নিজদের প্রকৃত অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে দেয় না। ইহাতে স্বার্থান্ধ নেতারা সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিবন্ধক।

দৈনন্দিন চালচাল আমাদের ইহাই বলে যে আমরা এই জাতীয় অনৈক্যকে আরও কিছু দিন জিয়াইয়া রাখিতে পারিব না। সারা পৃথিবীর গতি লক্ষ করিয়া, আজ আমরা অস্পৃশ্যের অস্পৃশ্য আর অস্পৃশ্য থাকিতে রাজি নহে। নিম্নজাতি আর নিম্নজাতি থাকিতে চাহে না। **অস্পৃশ্য ও নিম্নজাতি রাখিয়া কেবল তাঁহাদের সহিত অসম্মানসূচক ব্যবহারই করা হয় নাই - উপরন্তু আর্থিক স্বাতন্ত্র্য হইতেও তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করা হইয়াছে।** তাঁহারা কেন হাজার হাজার বৎসর পূর্বেকার নিয়ম ধরে থাকিতে চাহিবেন? স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতাগণও এই প্রথার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছেন। ইহার জন্য তাঁহারা সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। তাঁহাদের নিকট এই সামাজিক লড়াই রাজনৈতিক লড়াই হইতে কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। তাঁহারা জানেন যে যতদিন পর্যন্ত জাতপাতের ভেদাভেদ শেষ করা না যাইবে ততদিন জাতীয় ঐক্যকে দৃঢ়তম ভিত্তির উপর স্থাপিত করা যাইবে না। তাঁহারা ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন যে এই বিষয়ে ধর্মান্ধতাই সর্বাপেক্ষা বড় বাধা। কিন্তু তাঁহারা ধর্মান্ধতার ধার ধারেন না। তাঁহারা তো জাতিভেদের প্রশ্নে হিন্দু এবং ইসলাম ধর্মান্ধতাকে একইরূপে প্রহার করিয়া সমূলে নিক্ষেপ করিবেন।

দেখিয়া মনে হয় জাতিভেদ খুব দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত, কিন্তু একথা মনে করা ঠিক হইবে না। কারণ ইহার ভিত্তিমূলে দৃঢ়হস্তে আঘাত করা হইতেছে না। জাতীয় বিভেদের রূপ দুইটি - এক, খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে ছোঁয়াছুঁয়ি, অন্যটা, বিবাহে অসহযোগিতা। খাওয়ার ব্যাপারে ছোঁয়াছুঁয়ি তো সকলের প্রথমে ধনীরাই ভাঙ্গিতে আরম্ভ করেন। এই ধনীরাই নিজের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য জাতীয় সংগঠন ও জাতীয় ঐক্যের সর্বাপেক্ষা বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহাদের একটি অর্থ ছিল, বিলাতযাত্রার জন্য তাঁহারাই সর্বপ্রথম প্রস্তুত হন। যেখানে পূর্বে বিলাতে গেলে জাতি হইতে বহিষ্কৃত হইতে হইত, আজ বিলাতফেরতরাই জাতির শিরোমণি। কেবল দ্বারভাঙ্গা, বিকানীরই নহে, অন্যজাতির নেতাদেরও দেখুন। সর্বত্রই আজ বিলাতে সকল রকমের লোকের সহিত সকল রকমের যোগা যোগ করিয়া যাহারা ফিরিয়াছে তাহারাই নেতৃপদে আসীন। আই সি এস জামাতা পাইতে সমর্থ শ্বশুর নিজেকে ধন্য মনে করে।

গত কুড়ি বৎসরে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে ঐক্য খুব দ্রুতগতিতে স্থাপিত হইয়াছে। ১৯২১ সনের পূর্বে হিন্দু হোটেল দেখাই যাইত না। কিন্তু আজ ছোট

ছোট শহরগুলিতেই নহে অধিকন্তু ছোট ছোট স্টেশনেও অনেক হোটেল খোলা হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বেও কে ভাবিতে পারিত যে ছাপরা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের উপরেও হিন্দু মাংস-পরোটা বিক্রয় করিবে? আমার একটি বন্ধু একবার পাটনার কোন একটি হোটেলে ভোজন করিতে যান। একটি ছেলে তাঁহার পংক্তির পাশেই বসিয়াছিল। আর তাহার পাশে এক মৈথিলি ব্রাহ্মণ চন্দন টিকা ইত্যাদি লাগাইয়া বসিয়াছিলেন। জায়গাটা ছোট ছিল। আর ছেলেটির হাত ব্রাহ্মণের গায়ে লাগিল। তাহাতে তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইলেন। ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার জাত কী। আমার বন্ধু ছেলেটিকে চুপি চুপি বলিলেন - 'বল, চামার'। ছেলেটি তাহাই বলিলে ব্রাহ্মণের মুখের গ্রাস মুখেই রহিয়া গেল। তিনি কিছু বলিতে গেলে আশেপাশের লোকেরা তাহার উপর ক্ষিপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিল - 'এটা হোটেল, এখানে ডাল-ভাত বিক্রয় হয়। তুমি জাতের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? ব্রাহ্মণ ধিধায় পড়িলেন. যদি আহার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া যান তাহা হইলে শুধু পয়সাই নষ্ট হয় না, প্রকাশ্যে সকলের হাসিবার সুযোগও মিলিবে। ফলে বেচারা মাথা নিচু করিয়া চুপচাপ আহার সমাপ্ত করিল।

আহারাদির ব্যাপারে ছোঁয়াছুঁয়ির সমস্যার প্রায় সমাধান হইয়াছে। শিক্ষিত যুবক এই লইয়া হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য রাখিতে চাহে না। কিন্তু বিবাহের প্রশ্ন এখনো কঠিন মনে হয়। এক মুসলমান নেতা সমাজবাদীগণের নামে অত্যন্ত ঘাবড়াইয়া যাইতেন। বলিলেন - 'সমাজবাদীগণ জনগণের দারিদ্র্য দূর করিতে চাহে। ইসলামও সাম্যের প্রচারক, তবে তাহারা ধর্মবিরোধী কেন'?

আমি - 'সাম্যবাদীরা ধর্মের বিরুদ্ধে কণামাত্র শক্তিরও অপচয় করিতে চাহে না। তাহারা চাহে যে পৃথিবীতে সামাজিক অন্যায় আর দারিদ্র্য না থাকে।'

মৌলানা - 'এই ব্যাপারে আমি আপনার সহিত একমত।'

আমি - 'আপনিও আমাকে সাহায্যে করিবেন। আপনি কি সারা ভারতকে আহার ও বিবাহ ব্যাপারে এক করিতে রাজি আছেন?'

মৌলানা - 'তাহার কী প্রয়োজন?'

আমি - 'কারণ যতদিন দরিদ্রেরা একত্রিত হইয়া শোষকগণকে - তাহারা বিদেশীই হউক অথবা স্বদেশীয় - পরাজিত করিতে না পারিবে, ততদিন পর্যন্ত তাহার স্বাধীনতা লাভ করিতে সক্ষম হইবে না। নিজের শ্রমলব্ধ অর্থে নিজের ভোগের অধিকার অর্জন করিতে পারিবে না।'

মৌলানা - 'আহারের প্রশ্নে আমি একমত, কিন্তু বিবাহের ব্যাপারে নহে।'

পাশেই এক পণ্ডিতমহাশয় বসিয়াছিলেন। কথাবার্তায় তাহাকে উকিল বলিয়া মনে হইল। তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন - 'আপনারা তো অন্য দেশের ছাঁচে ভারতবর্ষকে গড়িতে চান। আপনারা এতটুকু চিন্তা করিবার কষ্ট স্বীকার করেন না যে ভারতবর্ষ ধর্মপ্রাণ দেশ। ইহার সভ্যতা ও সংস্কৃতি তুলনাবিহীন। ভারতবর্ষ এউরোপ হইতে পারে না। যাহা হউক খাওয়ার প্রশ্নে তো ভারত এক হইতে চলিয়াছে, কিন্তু বিবাহের প্রশ্ন তুলিয়া তো আপনি মূর্খতার একশেষ করিতেছেন।'

আমি - কিছুদিন পূর্বে আহারসম্বন্ধীয় একতাও নির্বুদ্ধিতার কথাই ছিল। যাহা হউক, আপনার তো আজ উহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। বিবাহের প্রশ্নও নির্বুদ্ধিতার কথা নয়। কুড়ি বছর পূর্বেও আলাদা আলাদা উনান দেখিয়া কে আশা করিতে পারিত যে আজিকার পরিবর্তন দেখিবার সুযোগ হইবে? হিন্দু প্রকাশ্যভাবে মুসলমান এবং খৃষ্টানের সহিত একত্রে বসিয়া ভোজন করে কিন্তু আত্মীয়স্বজনের সাধ্য কি তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে? হিন্দু মুসলমান বিবাহ আরম্ভ হইয়াছে। পণ্ডিত জওহরলালের ভ্রাতুষ্পুত্রী মুসলমান বিবাহ করিয়াছেন। আসফ আলির স্ত্রী অরুণা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নাই। প্রফেসর হুমায়ুন কবীর বাংলাদেশে এইধরনের বিবাহই করিয়াছেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যাইবে যেখানে হিন্দু যুবতী ধর্মপরিবর্তন না করিয়া বিবাহ করিয়াছে। হিন্দু যুবকও ধর্মের নিগড় ভাঙ্গিয়া বিবাহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। গুজরাতের এক সম্ভ্রান্তবংশীয় হিন্দু যুবক এক প্রতিষ্ঠিত মুসলমানের সুশিক্ষিতা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছে। ইহা নিশ্চিত যে ভবিষ্যতে এই ধরণের বিবাহ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। যেখানে সমাজের শক্ত বাঁধের ভিতর ক্ষুদ্রতম ছিদ্র দেখা দিয়াছে সেখানে তাহাকে টিকাইয়া রাখা কঠিন হইবে।

জাতিভেদ দূর করিলে একই ধর্মের মধ্যে বিবাহ সংখ্যা আরো অধিক হয়। কিন্তু আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য এই যে, যে কাজ করিতেই হইবে তাহাও লোকে অত্যন্ত মন্থরগতিতে করিতে চাহে। সুদৃঢ় জাতীয় ঐক্যস্থাপন আমাদের সর্বাধিক প্রয়োজন এবং ধর্মান্ধতা ও জাতিভেদকে কবরস্থ করিতে পারিলেই উহা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। আমাদের দেশের পরিস্থিতিতে যাহা অবশ্যম্ভাবী ও যাহা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই তাহা সম্পন্ন করিতে এরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন কি চরম মূর্খতা নহে?

ভারতবাসী এক জাতি। সকল ভারতবাসী — সে হিন্দু হোক অথবা মুসলমান, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী অথবা খৃষ্টান, আস্তিক অথবা নাস্তিক — সকলে একই জাতি—ভারতীয়। ভারতবর্ষের বাহিরে ইউরোপ ও আমেরিকাতেই নহে, প্রতিবেশী ইরান এবং আফগানিস্তানেও আমাদের হিন্দু (ভারতীয়) নামেই অভিহিত করা হইয়া থাকে। হিন্দু সভার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে নিজেদের মধ্যে জাতিভেদকে দূর করিতে যতই উৎসাহ দেখাক, তাহারা সময়-অসময়ে একথাও ঘোষণা করে যে হিন্দু এক পৃথক জাতি। মুসলমানেরা তো পণ করিয়াছে যে তাহাদের চিরদিনের জন্য একটি পৃথক জাতি করা হউক। তাহারা সেই ধারণা অনুসারেই ভারতবর্ষকে পৃথক পৃথক অংশে বিভক্ত করিতে চায়। নয় কোটি মুসলমানের মধ্যে সাত কোটির শরীরে সেই একই রক্ত যাহা হিন্দুর শরীরেও প্রবাহিত হইতেছে। অবশিষ্ট দুই কোটির মধ্যে কতজন আছেন যিনি বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন যে তাহার এক চতুর্থাংশ রক্ত ভারতবর্ষের বাহিরের কোন জাতির। রক্তের দ্বারা কি জাতি নির্ণয় হয়? আর এই কষ্টিপাথরে যাচাই করিলে পৃথিবীর কোন লোকই ভারতের বাহিরে ভারতবর্ষের মুসলমানকে অন্য জাতি বলিয়া স্বীকার করিবে না। ভাষার মধ্যে জোর করিয়া কিছু আরবী শব্দ ঢুকাইয়া কেহ নূতন জাতি সৃষ্টি করিতে পারে না। তিন -চতুর্থাংশ আরবী শব্দ বলিয়াও ভারতবর্ষের মুসলমান আরবে গিয়া ভারতীয় ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা বলিতে পারিবে না, কিংবা আরবীকে মাতৃভাষা করিতে পারিবে না। আমাদের যুবকেরা এই ভেদনীতি অধিকদিন সহ্য করিবে না। নবাগত সন্তানদের জন্য তো ইহাই ঠিক হইবে যে হিন্দু সন্তানের জন্য মুসলমানী এবং মুসলমান সন্তানের জন্য হিন্দু নামকরণ করা। এই সাথে ধর্মান্ধতাকেও প্রচণ্ডভাবে বাধা দিতে হইবে। আকার প্রকারের কৃত্রিম বিভেদেরও অন্ত ঘটানো হউক। এইভাবেই ধর্মান্ধদের আমরা সমুচিত শিক্ষা দিতে পারি।

ইহা নিশ্চিত যে জাতিভেদ উচ্ছেদ করিয়াই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করা যাইতে পারে।

অশ্রেণিক সমাজ

রাজশেখর বসু

'ক্লাসলেস সোসাইটি' বা অশ্রেণিক সমাজের কথা এদেশের ও বিদেশের অনেকে বলে থাকেন, কিন্তু তার লক্ষণ কেউ স্পষ্ট করে বলেছেন বলে মনে হয় না। শ্রেণী অনেক রকম আছে, ভারতীয় আর পাশ্চাত্য সমাজের শ্রেণীভেদ সমান নয়। সবরকম ভেদের লোপ অথবা কয়েক রকমের লোপ যাই কাম্য হোক, উপায় নির্ধারণের আগে বিভিন্ন ভেদের স্বরূপ বোঝা দরকার।

এমন আদিম জাতি থাকতে পারে যাদের মধ্যে শ্রেণীভেদ মোটেই নেই অথবা খুব কম। সভ্য সমাজ যদি পুরোপুরি অশ্রেণিক হয় তবে তার অবস্থা কেমন হবে তা কল্পনা করা যেতে পারে। জীবনযাত্রার মান সকলের সমান হবে, ধনীদরিদ্রের বৈষম্য থাকবে না, কারও যদি অধিক অর্থাগম হয় তবে অতিরিক্ত অর্থ সাধারণের হিতার্থে বাজেয়াপ্ত হবে। সকলেই সমান পরিচ্ছন্ন বা অপরিচ্ছন্ন হবে, বিবাহ ও সামাজিক মিলনক্ষেত্রে সুন্দর-কুৎসিত বা পণ্ডিত মূর্খের ব্যবধান থাকবে না। সকলেই শিক্ষা, জীবিকা, বিবাহ আর চিকিৎসার সমান সুযোগ পাবে। অবশ্য বিদ্যা বুদ্ধি আর বলের বৈষম্য থাকবেই, কিন্তু তার জন্য আর্থিক অবস্থা বা সামাজিক প্রতিষ্ঠার তারতম্য হবে না, দুঃসাধ্য রোগ বা বার্ধক্যের ফলে যারা অকর্মণ্য তাদের রক্ষা বা অরক্ষার ব্যবস্থা রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

ইতিহাসে দেখা যায় অল্পসংখ্যক লোক যদি অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হয় বা নির্যাতন ভোগ করে তবে তারা আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করে সমভোগী সংঘ গঠন করে। রোমান সাম্রাজ্যে অত্যাচারিত খ্রীষ্টানদের সমাজ প্রায় অশ্রেণিক ছিল। নাৎসি-বিতাড়িত অনেক ইহুদি-পরিবারও নির্বাসনে এসে শ্রেণীভেদ পরিহার করেছিল। কিন্তু অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভেদবুদ্ধি আবার পূর্ববৎ হয়।

বর্তমান হিন্দু সমাজে একই ভেদ বিভিন্ন মাত্রায় দেখা যায়। অব্রাহ্মণের বাড়িতে প্রাচীনপন্থী নিষ্ঠাবান অন্নগ্রহণ করেন না। যাঁরা অন্ন গোঁড়া তাঁরা বৈদ্যকায়স্থাদি ভদ্রশ্রেণীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন, কিন্তু পৃথক পঙ্‌ক্তিতে বসেন। যাঁরা আর একটু

উদার তাঁরা বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদির ভোজে পঙ্‌ক্তি বিচার করেন কিন্তু অন্যত্র করেন না। যাঁরা আরও সংস্কারমুক্ত তাঁরা কোনও ক্ষেত্রেই করেন না। ভোজন ব্যাপারে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ বহু শ্রেণীতে বিভক্ত, তবে এই ভেদ ক্রমশ কমে আসছে।

আমার এক ব্রাহ্মণ বন্ধু স্বজাতিকে চার শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। সর্বনিম্ন বা চতুর্থ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পরিচিত অব্রাহ্মণকে দেখলে আগেই নমস্কার করেন। কেউ কেউ এতই পতিত যে শূদ্রকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতেও তাঁদের বাধে না। যাঁরা তৃতীয় শ্রেণীর তাঁরা নমস্কার পাবার পর প্রতিনমস্কার করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ প্রতিনমস্কার করেন না, বড়জোর একটু হাত বা মাথা নাড়েন। প্রথম শ্রেণীর বিপ্র অতিবদান্য, প্রণাম পেয়েই পদধূলি দেবার জন্য পা বাড়িয়ে দেন।

উচ্চবর্ণের বা আভিজাত্যের অভিমান অসংখ্য লোকের আছে। যাঁরা অতি সজ্জন, অপরকে ক্ষুণ্ণ করার অভিপ্রায় যাঁদের কিছুমাত্র নেই, এমন লোকেরও আছে। এঁরা শাস্ত্রবিধি বা নিজ সমাজের চিরাচরিত প্রথা লঙ্ঘন করতে চান না, মনে করেন তাতে পাপ বা জাতিপাত বা মর্যাদাহানি হয়। অনেকে নির্বিচারে কেবল সংস্কার বা অভ্যাসের বশেই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখেন। যাঁরা অল্পাধিক সংস্কারমুক্ত তাঁদের প্রত্যবায়ের ভয় না থাকলেও নিজ সমাজের ভয় আছে, সেজন্য অবস্থা বুঝে নিয়ম পালন বা লঙ্ঘন করেন। যাঁরা আরও উদার ও সাহসী তাঁরা বর্ণানুসারে শ্রেণীবিচার করেন না, শুধু দেখেন পঙ্‌ক্তির লোকের বেশ ও আচরণ সভ্যজনোচিত কিনা। যাঁরা পূর্ণমাত্রার সমদর্শী তাঁরা কিছুই বিচার করেন না, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা অতি অল্প।

ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজের জাতিভেদ দূর করার চেষ্টা মাঝে মাঝে হয়েছে, কিন্তু তার ফলে ধর্মগত ভেদের উৎপত্তি হয়েছে। বৌদ্ধ, শিখ, বৈরাগী, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম প্রভৃতি সম্প্রদায় স্বতন্ত্র সমাজের সৃষ্টি করেছেন। অনেকে বলে থাকেন, রামকৃষ্ণ সংস্কারমুক্ত ছিলেন, বর্ণভেদের কঠোরতা মানতেন না। একথা যে মিথ্যা তা শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমাণ করেছেন। সম্প্রতি সংবাদপত্রে বহু নিবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ অব্রাহ্মণের

অন্ন গ্রহণ করতেন না। উচ্চ নীচ সকলের জন্য ভক্তিবাদ প্রচার করেছেন, ধর্মমতের সংকীর্ণতা নিরসনের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সমাজ ব্যবস্থা বা লোকাচারে হস্তক্ষেপ করেননি।

এককালে এদেশের ভদ্রশ্রেণীই উচ্চশিক্ষা আর ভদ্রোচিত জীবিকার সুযোগ পেত। দারিদ্র্যের জন্য এবং ক্ষমতাবান আত্মীয়-বন্ধুর অভাবে ভদ্রেতর শ্রেণী এই সুযোগ পেত না।

শিক্ষা আর প্রচারের ফলে জাতিগত বর্ণগত ও বংশগত ভেদবুদ্ধি দূর হতে পারে, কিন্তু অপরিচ্ছন্নতা আর অমার্জিত আচরণের প্রতি বিদ্বেষ ত্যাগ করা দুঃসাধ্য। শুচিতার ধারণা সকলের সমান নয়। এদেশের লোক আহারের পর আচমন করে, মলত্যাগের পর জলশৌচ করে, অতি দরিদ্রও প্রত্যহ স্নান করে। এই বিষয়ে অধিকাংশ পাশ্চাত্য জাতি অপেক্ষাকৃত অপরিচ্ছন্ন।

কয়েকটি বিষয়ে শুচিতায় শ্রেষ্ঠ হলেও ভারতবাসীর বদভ্যাস অনেক আছে। যে অপরিচ্ছন্নতা দারিদ্র্যের ফল তা ধরছি না, কিন্তু যারা অর্থবান ও ভদ্রশ্রেণীভুক্ত তাঁদেরও অনেক বিষয়ে শুচিতার অভাব দেখা যায়। বড় সওদাগরী আপিসে সাহেব আর দেশী কর্মচারীর জন্য আলাদা সিঁড়ি আছে। এখানকার দেশী সাহেবেরাও বোধ হয় এই ব্যবস্থা বজায় রেখেছেন। পার্থক্যের কারণ কি তা সিঁড়ি দেখলেই বোঝা যায়। ভারতবাসীর বিচারে নিষ্ঠাবানের স্পর্শই ঘৃণ্য, দৃশ্য নয়, যত্র তত্র থুতু ফেলার অভ্যাস বহু লোকের আছে, দেশী সিঁড়ির স্থানে স্থানে আধার আছে, কিন্তু তাতে অভীষ্ট ফল হয় না, আধার ছাপিয়ে দেওয়ালে পর্যন্ত পানের পিকের দাগ লাগে। সাহেবি সিঁড়ির এই বীভৎস কলঙ্ক নেই। যারা পরিচ্ছন্নতা চায় তাদের পৃথক সমাজ না হলে চলে না।

ক্লাব বা আড্ডায় সমশ্রেণীর লোকেই স্থান পায়। বিলাতী ক্লাবে প্রবেশের নিয়ম খুব কড়া, যে কেউ ইচ্ছা করলেই সদস্য হতে পারে না। বাঙালীর আড্ডায় সাধারণত, নির্দিষ্ট কয়েক জনকেই দেখা যায়, কিন্তু নূতন লোকও স্থান পায় যদি তার আচার ব্যবহার বিসদৃশ না হয়। ক্লাব বা আড্ডায় যে রীতি, দেবমন্দির বা উপাসনাগৃহেরও তাই। যিনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তিনি সাধারণত নিজ শ্রেণীর জন্যই করেন, এই কারণে নিম্ন জাতি মন্দিরপ্রবেশে বাধা পায়। কালক্রমে যদি

প্রতিষ্ঠাতার উত্তরাধিকারীদের স্বত্বের প্রমাণ লোপ পায় তবে সরকারি আদেশে আপামর সকলেই প্রবেশাধিকার পেতে পারে। ভারতের অনেক বিখ্যাত মন্দিরে তাই হয়েছে। কিন্তু যত দিন সে ব্যবস্থা না হয় তত দিন শ্রেণীবিচার বজায় থাকে। চণ্ডী-মণ্ডপ, ভাগবতসভা ব্রাহ্মসমাজ বা গির্জায় যদি কোন অপরিচ্ছন্ন ও কুৎসিত বেশধারী লোক আসতে চায় তবে তার উদ্দেশ্য ভাল হলেও সে বাধা পায়।

জাতিবিচার বা অপরিচ্ছন্নতার আপত্তি না থাকলেও নানা কারণে ভেদজ্ঞান আসে। আকৃতি, পরিচ্ছদ, ভাষা, খাদ্য, সংস্কৃতি, বিত্ত, সমাজ, ধর্ম, দেশ, রাজনীতি প্রভৃতির জন্যও শ্রেণীভেদ হয়। যেখানে অস্পৃশ্যতা নেই (যেমন মুসলমান ও ইউরোপীয় সমাজে) সেখানেও সৈয়দ ও মোমিন, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, ধনী ও দরিদ্র মলিনবেশ শ্রমজীবী আর মসীজীবীর সমাজ পৃথক। পাশ্চাত্য দেশের অনেক হোটেলে এশিয়া - আফ্রিকার লোক স্থান পায় না। কোনও কোনও রাষ্ট্রে আইন করে এই পার্থক্য নিবারণের চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু লোকমতের পরিবর্তন হয়নি। চণ্ডাল যদি শিক্ষিত সজ্জন ধনী ও ভদ্রবেশী হয় তথাপি সে নিষ্ঠাবান উচ্চবর্ণ হিন্দুর বিচারে অপাঙ্‌ক্তেয়। এশিয়া-আফ্রিকার লোকের উপরেও পাশ্চাত্য জাতির অনুরূপ ঘৃণা আছে।

এদেশে ধনী ও বিলাসী সমাজ সমশ্রেণী ভিন্ন বৈবাহিক সম্বন্ধ করতে চান না পাছে শ্বশুরালয়ে মোটা চালচলনে কন্যার কষ্ট হয় বা ঘরের মর্যাদাহানি হয়। অল্পবিত্ত হিন্দু যৌথ পরিবারে অসবর্ণ বিবাহ খুব কম দেখা যায়, কিন্তু যেখানে দম্পতির নিজের আত্মীয়বর্গ থেকে পৃথক হয়ে বাস করবার সামর্থ্য আছে সেখানে অসবর্ণ বিবাহ ক্রমশ প্রচলিত হচ্ছে।

ভারতের তুলনায় ইউরোপ আমেরিকার ভদ্রসমাজে আচারগত ভেদ কম। তথাপি রাজনীতিক কারণে বিদ্বেষ দেখা যায়। ব্রিটিশ ও জার্মান জাতির উৎপত্তির ধর্ম ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য বেশি নয়, কিন্তু যুদ্ধ বাধলেই জার্মানরা হুন অ্যাখা পায়। গত যুদ্ধে 'মিত্র-পক্ষে' থাকার সময় রাশিয়া জাতে উঠেছিল, কিন্তু এখন আবার অর্ধসভ্য এশিয়াটিক হয়ে গেছে, তাদের শায়েস্তা করবার জন্য বিজ্ঞানবলী জার্মান বীর জাতির প্রয়োজন হয়েছে।

লোকে কেবল যুক্তি আর ন্যায়বুদ্ধির বশে চলে না, বহুকাল থেকে বংশ পরম্পরায় যে সংস্কার বদ্ধমূল হয় তা দূর করা সহজ নয়। কালক্রমে শিক্ষা আর প্রচারের ফলে অনেক বিষয়ে ভেদজ্ঞান কমে যাবে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে শ্রেণীলোপের সম্ভাবনা অত্যল্প। বর্তমান সমাজে যে সব পরিবর্তন হচ্ছে তা থেকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই অনুমান করা যেতে পারে —

(১) বিদ্যা, বিচারশক্তি, নীতিজ্ঞান প্রভৃতি অর্জনের সামর্থ্য সকলের সমান নয়, কিন্তু জাতি বা বর্ণ শ্রেণী অনুসারে কোনও তারতম্য হয় না। পরিবেশ এবং শিক্ষার সুযোগ হলে সকল শ্রেণীর লোকেই তুল্য সামর্থ্য দেখাতে পারে। শ্রেণী বিশেষের সহজাত মানসিক উৎকর্ষ বা বংশগত আভিজাত্য থাকতে পারে না — এই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত কালক্রমে শিক্ষিত জন মেনে নেবে। যাদের দৃঢ়বদ্ধ অন্ধ সংস্কার আছে (যেমন হিটলারের সহকারিগণ, দক্ষিণ আফ্রিকার ডাচবংশীয় আফ্রিকান্ডার জাতি, মার্কিন দেশের নিগ্রো বিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় এবং এদেশের অনেক উচ্চ বর্ণের লোক) তাদের ধারণার পরিবর্তন হতে বিলম্ব হবে।

(২) অনুকূল লোকমত এবং সরকারি চেষ্টার ফলে এ দেশে অস্পৃশ্যতা শীঘ্রই দূর হবে।

(৩) যৌথ পরিবার লোপের ফলে অসবর্ণ বিবাহ ক্রমশ বহু প্রচলিত হবে, ভিন্ন প্রদেশবাসীর মধ্যেও বিবাহ বৃদ্ধি পাবে।

(৪) আকৃতি, পরিচ্ছদ, ভাষা সংস্কৃতি আর ধর্মের পার্থক্যের জন্য অপরের প্রতি যে বিরাগ দেখা যায় তা শিক্ষার বিস্তার এবং অধিকতর সংসর্গের ফলে ক্রমশ কমে যাবে।

(৫) যাদের বিদ্যা রুচি বৃত্তি বা রাজনীতি সমান তারা এখনকার মতো ভবিষ্যতেও সংঘ ক্লাব বা ইউনিয়ন গঠন করবে, কিন্তু এইপ্রকার দলবন্ধনের ফলে বর্ণভেদের তুল্য সামাজিক ভেদের উদ্ভব হবে না।

(৬) অনেক রাষ্ট্র সমাজতন্ত্র অনুসারে ধনী দরিদ্রের ভেদ কমাবার চেষ্টা করছে। তার ফলে দারিদ্র্যজনিত হীনতা যথা অশিক্ষা, অসংস্কৃতি, অপরিচ্ছন্নতা, প্রভৃতি ক্রমশ দূর হবে এবং সামাজিক বৈষম্য কমবে। কিন্তু ধনবৈষম্য একেবারে দূর হবে না, সোভিয়েট রাষ্ট্রেও হয়নি।

(৭) যে অপরিচ্ছন্নতা বহু দিনের বদভ্যাসের ফল তা দূর করার জন্য প্রবল প্রচার আবশ্যক যেমন অস্পৃশ্যতা নিবারণের জন্য হয়েছে। যারা রাজনীতি প্রচারকার্যে নিযুক্ত আছেন তাঁরা জনসাধারণের বদভ্যাস নিবারণের জন্য কিছু সময় দিলে সমাজের মঙ্গল হবে। সংবাদপত্রেরও এ বিষয়ে কর্তব্য আছে।

(৮) পূর্বের তুলনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে বিবাহ বেড়েছে, কিন্তু বহুপ্রচলিত হবার সম্ভাবনা কম। এইরূপ বিবাহের ফলে নূতন ইউরোপীয় সমাজের সৃষ্টি হচ্ছে না, সন্তানরা পিতা বা মাতার সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক জাতিরই কতকগুলি দৈহিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। রূপবিচারের সময় লোকে সাধারণত সেই সব বৈশিষ্ট্যর প্রতি লক্ষ্য রাখে। কটা চোখ আর কটা চুল অধিকাংশ ভারতবাসীর পছন্দ নয়। এই প্রকার রুচি ভেদের জন্য বিবাহের ক্ষেত্রে শ্রেণীভেদ মোটের উপর বজায় থাকবে তবে, কালক্রমে রুচির পরিবর্তন হতে পারে। শুনতে পাই, পাশ্চাত্য সমাজে নিগ্রো জাজ সঙ্গীতের মতো নিগ্রো দেহসৌষ্ঠবেরও সমঝদার বাড়ছে।

মোট কথা, অচির ভবিষ্যতে পূর্ণমাত্রায় অশ্রেণিক সমাজ হবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু এই আশা করা যেতে পারে - মানুষের ন্যায় বুদ্ধি ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে, তার ফলে শ্রেণীগত বৈষম্য কমবে। যে ক্ষেত্রে জনসাধারণ উদাসীন সেখানে রাষ্ট্রীয় চেষ্টায় সামাজিক অন্যায়ের প্রতিকার হবে, তার ফলেও শ্রেণীভেদ কমবে। মানব স্বভাবের যে বৃহৎ অংশ জন্মগত নয় শিক্ষাচর্চা আর পরিবেশের ফল, সেই অংশের গঠনে সম্ভবত ভবিষ্যতে সকলেই সমান সুযোগ পাবে। তবে এই সামাজিক পরিবর্তন সকল রাষ্ট্রে সমান ভাবে ঘটবে না।

প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানের অধোগতি

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

প্রাচীন ভারতে উপযোগী কারুকর্ম ও বিজ্ঞানের (নেহাতই হাতের কাজ থেকে আলাদা) চর্চা করতেন উচ্চতর শ্রেণীর লোকেরা। 'শুক্ল যজুর্বেদ' ও 'তৈত্তিরীয় সংহিতা'য় পাওয়া যায় বহু বৃত্তির নাম, তার থেকে ঐ পর্বের সমাজের অবস্থা জানা যায় দুর্ভাগ্য এই যে, সবচেয়ে কড়া চেহারায় জাতিভেদ ব্যবস্থা চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ সবকিছুর জ্ঞানই নষ্ট হয়ে গেল। 'কামসূত্র' বলে বাৎস্যায়নের প্রাচীন গ্রন্থে চৌষট্টি কলা বা কারুকর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে এই নামগুলোও আছে :

সুবর্ণ-রত্ন-পরীক্ষা — বা সোনা ও রত্নের পরখ ও দাম ঠিক করা।

ধাতুবাদঃ — বা রসায়ন ও ধাতুবিদ্যা।

মণিরাগাকরজ্ঞানম্ — বা মণি-মাণিক্যের রঙ এবং খনি ও পাথরের উৎস সম্পর্কে জ্ঞান।

'শুক্রনীতিসার' বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উপাদান সম্পর্কে শুক্রাচার্য-র বইটেতেও বিভিন্ন কলার বিবরণ পাওয়া যায়, যেমন :

'পাথর ও ধাতু ভেদ ও ভস্ম করার কারুকর্মকে "কলা" বলা হয়'।

'ধাতু, ওষধি ও গাছগাছড়ার সংযোগ-ক্রিয়ার জ্ঞানকেও "কলা" বলে গণ্য করা হয়।'

'ধাতুর সঙ্কর (মিশ্রণ) পৃথক করাকেও "কলা" বলা হয়।'

'ক্ষার নিষ্কাশনকেও "কলা" বলে গণ্য করা হয়। আয়ুর্বেদে সর্বসমেত দশটি "কলা" আছে।'

দেখা যায়, কবি বাণের সঙ্গীতের মধ্যে একজন হচ্ছেন ধাতুশুদ্ধি-পরীক্ষক ও একজন ধাতুবিশারদ। সংস্কৃত সাহিত্যে "লোহবিদ্" ও "ধাতুবিদ্" জাতীয় শব্দ পাওয়া যায় বহুবার। এর থেকেই দেখা যায়, ধাতুবিশারদদের খুবই সম্মান করা হতো ও বিশেষজ্ঞদের জ্ঞানের কদর ছিল।

ধাতুশিল্পের উৎকর্ষ পৌঁছেছিল প্রায় চরমে। পাকা রঙের সঙ্গে মিল ছিল

টায়ার-এর পার্পল রঙের (লাল ও নীল মেশানো রঙ, সঙ্গে সাদা বা কালো বা দু-এরই ছোঁয়া আছে)।

বৈদিক যুগের ঋষিরা নিজেদের নিয়ে কোনো বিচ্ছিন্ন জাত ছিলেন না। তাঁদের সুবিধা বা স্বাভাবিক রুচি অনুযায়ী তাঁরা বিভিন্ন বৃত্তি পালন করতেন। এইভাবেই পূরণ হয়েছিল এমার্সন-এর প্রদত্ত আদর্শ: "মানুষের চরিত্রেই কি তার বৃত্তি নেই? প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব পেশা আছে। দক্ষতাই সেই বৃত্তি।" **বৌদ্ধধর্মের অবনতি বা বিতাড়নের পরে ব্রাহ্মণরা যখন আবার তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করলেন, তখনই কিন্তু এর সব কিছু বদলে গেল।**

আরও কড়া চেহারায় নতুন করে প্রতিষ্ঠা করা হল জাতিভেদ প্রথা। মনু ও পরবর্তী সব পুরাণের কৌকটাই হলো পুরোহিত শ্রেণীকে গৌরবান্বিত করার দিকে। তার থেকেই খাড়া করা হলো সবচেয়ে উদ্ধত ও উৎকট সব দাবি। সুশ্রুতের মতে, শল্যবিদ্যার ছাত্র-র পক্ষে শবব্যবচ্ছেদ না করলেই নয়। এই মহাজ্ঞানী বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলেন পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ থেকে জ্ঞান অর্জন করার ওপর। কিন্তু মনুর কাছে তা অচল। তাঁর মতে, শবদেহের ছোঁয়াটুকুই ব্রাহ্মণের পবিত্র দেহ দূষিত করার পক্ষে যথেষ্ট। তাই বাগ্‌ভট-র অল্প কিছু পর থেকেই দেখা যায় : শল্য ধরার ব্যাপারে আর উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে না। শারীরস্থান (অ্যানাটমি) ও শল্যবিদ্যার চল উঠে গেল, হিন্দুদের কাছে তা কার্যত লুপ্ত বিজ্ঞান হয়ে দাঁড়াল। সাইক্লোপ্‌স্ (গ্রীক পুরাণের একচক্ষু দৈত্য) -এর মতো হাপরের সামনে ঘেমে চলাকে মনে করা হতো সমান মানহানিকর। এর জন্যেই সমাজের সুচারুতর শ্রেণীরাই কলাচর্চা করতেন। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে তার জীবন্ত ছবি পাওয়া যায় শুধু সুদূর অতীতের ঐতিহ্য হিসেবেই।

কারুকর্মকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো নিচু জাতের কাছে : পেশাগুলোকে করে দেওয়া হলো বংশগত। ফলে নিশ্চয়ই হাতের কাজে কিছুটা সূক্ষ্মতা, চারুতা ও দক্ষতা বজায় থেকেছিল। কিন্তু তার দাম দিতে হয়েছিল মারাত্মক। সমাজের মননশীল অংশকে সরিয়ে নেওয়া হলো কারুকর্মে সক্রিয়ভাবে যোগ দেওয়া থেকে। প্রাকৃতিক ঘটনার 'কী করে' ও 'কেন' — কার্যকারণ সমন্বয় — তাই নজরে পড়ল না—অনুসন্ধানের মতিই ধীরে ধীরে মরে গেল সেই জাতির

মধ্যে, যে জাতির স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল অনুধ্যান আর অধিবিদ্যার সূক্ষ্মতার দিকে। পরীক্ষামূলক ও আরোহী বিজ্ঞানের শাখাগুলিকে ভারত এবার বিদায় জানাল। বয়েল, দেকার্ত বা নিউটন-এর জন্মের পক্ষে তার মাটি হয়ে উঠল নৈতিকভাবে অনুপযোগী, তার নামটুকুও প্রায় মুছে গেল বিজ্ঞান জগতের মানচিত্র থেকে।

মননের অসাড়তা ও জড়তার এই দেশে হাতের কাজ-করা শ্রেণীর লোকে পুরনো ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাঁরা পড়ে গেছেন একা, নিজের সহজাত বুদ্ধি আর পোক্ত কাণ্ডজ্ঞান (এ জগতে যা তাঁদের একমাত্র উত্তরাধিকার) ছাড়া তাঁদের চালনা করার আর কিছুই নেই। নিজেদের মতো করে তাঁরা সোনা-রূপোর গয়নার কাজ, ধাতুর গায়ে আলঙ্কারিক নক্‌শা, হাতির দাঁত খোদাই, কলাই, সুতো-বোনা, রঙ করা, লেস বোনা, স্যাকরা ও মণিকরের কাজ ইত্যাদিতে চমৎকার দক্ষতা দেখান।

কিছু নিজস্ব ভাবনা চিন্তা

মনোরঞ্জন ব্যাপারী

এক নদীর পাড়ে এক সাধু একা বাস করেন। তিনি এ অঞ্চলের লোক নন। কোন অন্য এলাকা থেকে এসেছেন। তার চালচলন কথা-বার্তা শুনে মানুষের ধারণা হয়, উনি একজন মহাজ্ঞানী প্রাজ্ঞ দূরদর্শী মানুষ। একদিন ওনাকে গ্রামে নিয়ে গিয়ে ওনার কথা শোনা দরকার। এতে মানুষ অনেক কিছু শিখতে জানতে পারবে। গ্রামের কয়েকজন মাথা মাথা লোক গিয়ে একদিন সাধুকে অনুরোধ করলো — আমাদের গ্রামে এক ধর্ম সভার আয়োজন করা হয়েছে। আপনি চলুন। গিয়ে ধর্ম বিষয়ে মানুষজনকে কিছু বলুন।

তখন সাধু বলে, ওখানে গিয়ে আমি কী বা করবো আর কী বা বলবো! আমি যা নিয়ে বলবো সে সব তো সবার জানা কথা। যদি নতুন কিছু বলতেই না পারলাম তবে ওখানে গিয়ে কী হবে।

মাতব্বররা বুঝতে পারে, সাধু বুদ্ধি করে পাশ কাটাতে চায়। সে তার বিশাল জ্ঞানের ভান্ডার লোকের সামনে প্রকাশ হতে দিতে চায় না। তখন তারা সাধুকে চেপে ধরে — 'আপনার কোন কথা আমরা শুনবো না। আমাদের সাথে আপনাকে যেতেই হবে। না গেলে আমরা আপনার দরজা থেকে নড়বো না।'

নাছোড়বান্দা লোকজনের চাপে অবশেষে সাধু বাধ্য হলেন ধর্ম সভায় যেতে। যখন ওনাকে কিছু বলবার জন্য মঞ্চে তোলা হল, উপস্থিত শ্রোতা-দর্শক-ভক্তদের দিকে তাকিয়ে উনি বললেন — আমি জানি আপনারা আমার চেয়ে অনেক কিছু অনেক বেশি জানেন। তা যখন আপনাদের কাছে আমায় কিছু বলতেই হবে, তখন আমি একটা প্রশ্নের একটু উত্তর জেনে নিতে চাই। আপনারা কি সবাই ভগবানকে মানেন? ভগবান বলে যে এক মহাশক্তিধর আছেন, তা জানেন?

প্রশ্ন অতি সহজ। এর উত্তর আরো সহজ। সমস্বরে সবাই জবাব দেয় - আমরা ভগবানকে মানি। ভগবান আছে তা জানি। তখন সাধু বলে - আপনারা যখন ভগবানকে মানেন, তিনি যে আছেন তা জানেন, তাহলে আমার আর কি বলার থাকতে পারে। আমি চলি।

লোকজন বোকা নয়, তারা বুঝতে পারলো যে সাধু তাদের কাছে কিছু না বলে বুদ্ধি করে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। কিন্তু এনার কাছ থেকে তো ধর্ম বিষয়ে কিছু

শোনা খুব দরকার। তখন তারা আবার আর একদিন আর একটা ধর্ম সভার আয়োজন করলো এবং তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে স্থির করলো যে 'এবার যদি সাধু তাদের ওই প্রশ্ন করে তাহলে সবাই, একযোগে বলব যে আমরা ভগবানকে মানি না। ভগবান বলে কিছু আছে কিনা, তা জানি না। দেখি সাধু কী বলে।' এই বুদ্ধি করে আবার তারা সাধুকে জোর করে ধরে নিয়ে এল।

যথারীতি মঞ্চে উঠে সাধু আজো সেই একই প্রশ্ন করলেন - আপনারা কি ভগবানকে মানেন? তিনি যে আছেন তা জানেন? রেডিমেড উত্তর তো সবার গোছানো ছিলো। একযোগে মাথা নাড়ল সবাই — না, না, না। আমরা কেউ ভগবানকে মানি না। ভগবান বলে কিছু আছে কিনা জানি না।

তখন সাধু বলে - তাহলে আমার আর তো কিছু বলার নেই। আপনারা যখন ভগবানকে মানেন না, সে আছে না নেই, তা জানেন না, আমার আর কী বলার আছে!

সেদিনও সাধু কিছু না বলে ফিরে চলে গেল। তখন সবাই আবার আলোচনায় বসল। কী করা যায়! লোকটাকে দেখে বোঝা যায় অনেক তীর্থ ঘুরেছে, অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। ধর্ম বিষয়ে অনেক কিছু জানে। কী করে তাকে দিয়ে কথা বলানো যায়। শেষে সবাই ঠিক করলো যে আবার আর একটা ধর্ম সভার আয়োজন করা হোক। এবার অর্ধেক লোক বলবো যে ভগবানকে মানি, অর্ধেক বলবো মানি না। দেখি সাধু কিছু না বলে কি ভাবে পাশ কাটিয়ে যেতে পারে

এক দু মাস পরে আবার ধর্ম সভায় কিছু বলার জন্য জোর জবরদস্তি করে নিয়ে আসা হল সাধুকে। এবারও তিনি সবাইকে একই প্রশ্ন করলেন — ভগবানকে মানেন? পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে মানুষ দুভাগ হয়ে গেল। এক ভাগ বলল — মানি, অপর ভাগ বলল — মানি না।

তখন সাধু বলে, আমার কাজ এখন আরো খুব সহজ হয়ে গেল। আর আমার গলা ব্যথা করে কিছু বলার কোন আবশ্যকতা রইলো না। আপনারা যারা ভগবানকে মানেন, কেন মানেন তা, যারা মানেন না তাদের বুঝিয়ে বলে দিন। আর আপনারা যারা মানেন না, কেন মানেন না তা, যারা মানেন তাদের বলে দিন : এভাবে সব মিটে যাবে। এখানে আমার আর কী কাজ!

সাধু যখন একা একা ফিরে যাচ্ছেন একজন লোক সভা ছেড়ে তার পিছু নিল। সে কিছু দূর এসে ফাঁকা জায়গায় পথ আটকে দাঁড়ালো সাধুর, আপনি চলে

যাচ্ছেন। জানি আপনাকে কোনভাবে আটকানো যাবে না। কিন্তু যাবার আগে দয়া করে আমার একটা কথার উত্তর দিয়ে যান। আপনি তিন তিনবার মঞ্চে উঠলেন, আমার মন বলছে আপনি কিছু বলতে চাইছিলেন। আপনার প্রশ্নের ঠিক কী উত্তর আপনি আশা করেছিলেন, যে উত্তরটা পেলেই আপনি কিছু বলতেন? সে উত্তরটা কী?

সাধু তার ভূয়োদর্শী দৃষ্টি দিয়ে লোকটাকে দেখে বুঝে নিলেন ওই হাজার হাজার মানুষ যা শুধু এক ভিড় মাত্র, তার মধ্যে এই একটি মাত্র লোক, যে বুদ্ধিমান। যার জিজ্ঞাসা বড় প্রবল। যে জ্ঞানপিপাসু, যে জ্ঞান আহরন করে, অন্বেষণ করে। একে যা দান করা যাবে সযতনে সঞ্চয় করে রাখবে।

তিনি বলেন— 'আমার যে প্রশ্ন তার একটাই উত্তর ছিলো যা পেলে আমি কিছু বলতে চাইতাম - তা হল নিরুত্তর। আমার প্রশ্ন শুনে যদি কেউ কোন কথা না বলতো, যদি নির্বাক মৌন নীরব হয়ে যেতো, যদি সতৃষ্ণ চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতো, যদি কি বলবে ভেবে দিশেহারা হোত, তা হলেই আমি কিছু বলতে পারতাম। আমার প্রশ্ন শোনার সাথে সাথে খাঁচায় পুরে রাখা পোষা তোতার শেখানো বুলির মত সবাই চটপট উত্তর দিয়ে দিল। এর একটাই সোজা অর্থ যে প্রত্যেকে কিছু বাধাধরা শব্দ দিয়ে যে যার পাত্র পূর্ণ করে রেখেছে। যার মধ্যে নিজস্ব কোন চিন্তন-মনন-বিচার-বিশ্লেষণ বা সংযোজন-পরিবর্জনের ছাপ নেই। এখন যে পাত্র পূর্বেই টইটুম্বুর ভরা, একটুও খালি নেই, সেখানে আমি যা রাখতে চাইবো স্থান হবে কেমন করে! সব যে উপচে চলকে পড়ে যাবে! তাই এদের কাছে কিছু বলা মানে অকারণে কথার অপচয়।'

আমাদের দেশ কাল সময় সমাজের অধিকাংশ মানুষ এই প্রচলিত পূর্বাহ্নে প্রস্তুত করে রাখা, মুখস্থ করিয়ে দেওয়া, বাধা ধরা কতগুলো শব্দ, সিদ্ধান্ত, ধারণা, প্রশ্ন এবং উত্তর মালার উপর আজীবন দাঁড়িয়ে আছে। সে সব নিয়ে চিন্তন মনন পুনর্বিবেচনা সমীক্ষা বা পর্যালোচনার যে কোন প্রয়াস আছে, তা প্রতীত হয় না, যেন অশিক্ষা অপশিক্ষার অন্ধকারে অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে অন্ধত্বের উপাসনা করে ভাবছে তারা আলোর পথের যাত্রী। এই শ্রেষ্ঠ, এই মহান এর বাইরে আর কিছু চাইনা।

সেই কবে কতো হাজার বছর আগে, যখন মানব সভ্যতার শৈশব কাল, সদ্য গুহাকন্দর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে বের হয়ে এসেছে মানুষ, তখন একজন

লোক, যে লোকটার উন্নত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান তো বহু দূরের ব্যাপার, সামান্য বয়ন শিল্পের সাধারণ জ্ঞানের অভাবে নেংটা উদোম হয়ে থাকতে হোত, যে সামান্য নখ কাটবার জন্য ক্ষুর কাচি নির্মাণের কারিগরি দক্ষতাটুকুও আয়ত্ব করতে পারেনি, আকাশে ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্র বিদ্যুৎ দেখে ভীষণ ভীত হয়ে ধারণা বা আশঙ্কা করেছিলো এবং গভীর বিশ্বাসে সেটা সে প্রচার করেছিলো যে এর পিছনে কোন না কোন এক অদৃশ্য শক্তির হাত আছে, যাকে দেখা যায় না, যার নাম দিয়েছিলো ভগবান বা ঈশ্বর। ভগবানের তত্ত্ব জনমানসে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পর এক এক করে আগমন ঘটেছে তেত্রিশ কোটি দেব দেবতার।

এসব দেব দেবতা পরবর্তীকালে কেমন করে এসেছে, কারা এনেছে, সে এক দীর্ঘ কাহিনী। যাদের পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছরের উপর বয়েস তাঁদের স্মরণে থাকতে পারে একটা সিনেমা কাহিনীর মধ্য দিয়ে সত্তর দশকের শেষপাদে কেমন করে সন্তোষী নামক এক দেবীর জন্ম হয়ে ছিলো। যে দেবীর পূজার প্রসাদ ছোলা আর গুড়।

অনুমান করে নিতে অসুবিধা নেই, যে তেত্রিশ কোটি দেব দেবতারও জন্ম এভাবেই হয়েছে। মানুষ এখনো বিশ্বাস করে, তখনো বিশ্বাস করতো, যে জপতপ পূজা অর্চনা স্তবস্তুতি নানাবিধ মন্ত্র বর্ণিত ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে সেইসব অশুভ শক্তিকে বশ বা অনুকূলে আনা যায়। তাই দেব দেবতা ভগবানকে শান্ত বা তুষ্ট করার প্রয়াস প্রচেষ্টা বিশ্বাসী মানুষ চালিয়ে যাচ্ছে। সেই প্রায় আদিম অন্ধকার যুগ কবে চলে গেছে। জ্ঞানে বিজ্ঞানে চিন্তা চেতনায় মানব জাতির কত না অগ্রগতি ঘটেছে। এখন মানুষ উড়ে যেতে পারে মহাকাশের দূরতম গ্রহে। নেমে যেতে পারে মহাসমুদ্রের গভীরতম প্রদেশে। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের সচিত্র বিবরণ পেয়ে যেতে পারে নিজের ঘরে বসে টেলিভিশনের পর্দায়। প্রিয় পরিচিত মানুষটির সাথে বাক্যালাপ সেরে নিতে পারে লক্ষ মাইল দূরে বসে।

বিজ্ঞানের এই অত্যাশ্চর্য্য জয় যাত্রার কালেও মানুষ সেই আধা নেংটা আধা মানব, বুনো জংলি অশিক্ষিত লোকটার কথা নত মস্তকে মেনে নিয়ে ভক্তি গদগদ গলায় স্বীকার করে নিয়েছে, তার কথা অভ্রান্ত। একেবারে একশো ভাগ সত্যি—ভগবান বলে একজন নিশ্চয় আছেন যিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সঞ্চালক।

এই বিংশ শতাব্দীতে যখন মানুষ চাঁদে ঘরবাড়ি বানাবার কথা ভাবছে, তখনো

তার সাহসে কুলাচ্ছে না এমন প্রশ্ন করার যে তিনি যদি আছেন তো আছেন কোথায়? সেখানে বসে উনি করেনটা কী? তার সৃষ্ট মানবকুল আজ যে শোকে দুঃখে অপমানে অত্যাচারে মানবেতর পশু তুল্য জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছে, তারই নাম নিয়ে দোহাই দিয়ে একদল শয়তান যে সিধাসাদা সরল নিরীহ মানুষকে— যে মানুষের মধ্যে তার বহু প্রকৃত ভক্ত রয়েছে যারা তাকে দুবেলা ফুল জল নকুল দানা খাওয়ায় তাদের নানাবিধ পীড়ন শোষণ দমন করছে। তা কি তিনি দেখতে পান না?

যদি তিনি এ অন্যায় অত্যাচার দেখেও চুপ করে থাকেন, যদি কোন প্রতিকার না করেন, তবে সে অন্ধ অক্ষম অথর্ব ভগবান দিয়ে আমার কী হবে। তিনি বেঁচে থাকা বা মারা যাওয়া দুটোই আমার কাছে সমান। আমি সে ভগবানকে, যে ভগবান বৃহত্তর মানব সমাজের মঙ্গলের জন্য কোন ভূমিকা নিতে ব্যর্থ তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করি।

ভগবান বলে পৃথিবীতে কিছু নেই। ভগবান নাম যার স্বার্থের পক্ষে সহায়ক তার কাছে প্রবলভাবে থাকতে পারে। তা তিনি থাকুন। কিন্তু যতক্ষণ আমার কাছে তিনি প্রমাণ না দিতে পারছেন ততক্ষণ নেই। ধূর্ত মুর্খ গুরু গোসাঁইদের তোতাবচন নয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাই। আমার দরজা খোলা আছে। তবে আসুক না একদিন, চা খেতে খেতে দুটো কথা বলে নেবো।

ভগবান নেই এ কথা বলার জন্য ভীষণ সাহস দরকার। দরকার বিজ্ঞানভিত্তিক সুগভীর জ্ঞান আর ক্ষুরধার যুক্তি বুদ্ধি তর্কের অস্ত্র। এই একটি কথা বলার রসদ সংগ্রহের জন্য মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন হাজার হাজার মাইল পথ হেঁটেছেন। পাহাড় প্রমাণ ধর্মপুস্তক সংগ্রহ করে পড়েছেন। তবেই বিশ্ববাসী-বিশ্বাসী মানুষদের সামনে প্রচলিত এবং প্রতিষ্ঠিত ধারণার বিরুদ্ধে তাঁর মত, সিদ্ধান্ত, বক্তব্য মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছে।

ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করার জন্য যে অধ্যবসায়, অধ্যয়ন, অনুশীলন প্রয়োজন, যে ভীষণ বিপদের ঝুঁকি, (মনে রাখা দরকার যে পৃথিবীতে বহুবার ধর্ম বিশ্বাসীরা নিরীশ্বরবাদী বা নাস্তিকদের নির্মমভাবে হত্যা করেছে। কিন্তু নাস্তিকেরা কোথাও কোন ধর্ম বিশ্বাসীকে মেরেছে এমন উদাহরণ একটাও নেই), ভগবান আছেন, এ কথা বলার জন্য তার লক্ষ ভাগের এক ভাগও অধ্যয়ন বা যুক্তি বুদ্ধি জ্ঞানের আবশ্যকতা পড়ে না।

মানুষ এক সমাজবদ্ধ প্রাণী। সে সবার সঙ্গে মিলেমিশে নিরাপদে থাকা পছন্দ করে। সে সাধারণত কোন বিরোধ বা বিতর্কে জড়াতে চায় না, বিশেষত যাতে প্রত্যক্ষ কোন লাভ বা ক্ষতি দৃষ্টিগোচর হয় না। কী দরকার বাপু ভগবান নেই বলে। ফালতু একটা ঝামেলা। সবাই যখন বলছে, মানে, আমিও মানি। এবং তার সেই মেনে নেওয়াটা সে পেয়েছে তার মা বাবার কাছ থেকে। সে আবার তার সন্তানের মধ্যে শিশুকালে এই বিশ্বাসের শেকড়টা চারিয়ে দেবে।

ধরা যাক এক কট্টর গোঁড়া সাত্ত্বিক হিন্দু ধার্মিক পরিবারের একটা শিশু জন্মের পরে হারিয়ে গেল। তাকে কুড়িয়ে নিয়ে গেল এবং মানুষ করে তুলল কোন মুসলমান খৃষ্টান বা বৌদ্ধ পরিবার। যে পারিবারিক পরিমণ্ডলে সে মানুষ হবে তার মনের মধ্যে সেই ধর্ম, সংস্কার, সংস্কৃতি, আচার, বিচার প্রভাব ফেলবে। সে আর ভগবান বা পূর্বজন্ম পরজন্মে বিশ্বাস রাখবে না। যদি সে কোন সাঁওতাল পল্লীতে মানুষ হয়, পূজা করবে করম দেবতার। যদি গোন্ড উপজাতির ঘরে বেঁচে বেড়ে ওঠে,ভক্তি শ্রদ্ধা করবে রক্তপ্রিয় দেবতা —আঙার।

আর যদি ওই বাচ্চাটিকে রাহুল সাংকৃত্যায়নের তত্ত্বাবধানে তাঁর আশ্রমে রেখে দেওয়া হয়, একথা বলার দরকার নেই, যে সে এক ধর্মমুক্ত পণ্ডিত মানুষ হবে। এটা ভাববাদ নয়, যুক্তিবাদ। যে কেউ পরখ করে দেখতে পারে। ধর্ম বা ভগবান বিশ্বাস মানুষের জন্মজাত নয়। এটা একান্তই পরিবেশ নির্ভর। ফলে দূর- দুর্গম গ্রামের এক নিরক্ষর মুর্খ চাষী যে জোরের সাথে বলতে পারে 'তিনি আছেন', আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এক নোবেল পুরস্কার পাওয়া বিজ্ঞানী সে জোরে বলতে পারেন — 'না তিনি নেই'। আবার এমন অধ্যাপকও আছেন যিনি ক্লাশে ছাত্রদের পড়ান — এই পৃথিবীর উৎপত্তি হয়েছে সূর্য গ্রহে এক প্রবল বিস্ফোরণের ফলে, মানুষ এসেছে বানর তুল্য এক প্রজাতি থেকে ধাপে ধাপে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজ এই পর্যায়ে, তিনিই গৃহে গমন করে মায়ের গুরুদেবের কাছে হেটমুন্ড হয়ে শ্রবণ করেন ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ। কেমন করে ব্রহ্মা নামক একজন পৃথিবী কী ভাবে সৃজন করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানব পশুপ্রাণী জীব সকল, সেই আজগুবি কথন।

ধর্ম সর্বদেশে সর্বকালে রাজতন্ত্রের সহায়করূপে কাজ করেছে। রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় একশ্রেণির ধূর্ত, শ্রম-বিমুখ কিন্তু যোগ্য, যাঁদের ব্রাহ্মণ বলা হয় তাঁরা একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়ে ভাগ্য-ভগবান, দেব-দেবতা পূর্বজন্ম-

পরজন্ম, স্বর্গ-নরক এসব তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। এসব যে মিথ্যা সেটা তিনি জানেন না এমন নয়। কিন্তু বিশ্বাসী মানুষ, যা তাঁকে আবর্তন করে রয়েছে তা থেকে বিচ্ছিন্ন বা বৈরী হবার ভয়ে চুপ করে থাকেন। (সূর্য স্থির, পৃথিবী তার চারিদিকে ঘোরে বলার পরে গ্যালিলিওকে গৃহবন্দি করা হয়েছিল)।

বলা হয়ে থাকে যে কোথায় কোন এক ক্ষীর সমুদ্রে শেষনাগ নামের এক সাপের পাহারায় ভগবান বিষ্ণু নামের এক ভদ্রলোক অনন্ত শয্যায় শুয়ে থাকেন। ইনি সৃষ্টির পালন কর্তা। যারা বস্তুবাদী দর্শন মেনে চলেন তারা বলেন, আগে বস্তু তারপরে কল্পনা। এমন কোন কল্পনা মানুষের পক্ষে কখনো করা সম্ভব হবে না যার সঙ্গে কোন বস্তুর মিল নেই। মানুষ নিজেকে জগতের সবচেয়ে মহান সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জীব বলে মনে করে। ফলে তার কল্পনায় যত দেব দেবী ভগবান এসেছে সব মানুষেরই আকার আকৃতি নিয়ে এসেছে এবং সবাই ভারতীয় শালীন পোষাক — শাড়ি-ধুতি পরা! তেত্রিশ কোটি দেবতার একজনও পাওয়া যাবে না পৃথিবীর সবচেয়ে সুসভ্য বলে প্রচার হওয়া পোষাক কোট-প্যান্ট-টাই-বুট পরা। স্কার্ট পরা কোন দেবীরও দেখা মিলবে না। এর কারণ — যে কালে দেব দেবতার কল্পনা করা হয়, সম্ভবত ভারতবাসী যেমন পোষাক পরতো তাদের দেবদেবীকেও তেমনি পোষাকেই কল্পনা করেছে।

যাই হোক, তা সেই ভগবান বিষ্ণু, যখন তাঁর ঘুম ভাঙে, মাঝে মাঝে কোন মানবীর গর্ভে জন্ম নিয়ে পৃথিবীতে আসেন। তাঁর ঘুমিয়ে থাকার অবকাশে পৃথিবীতে যে পাথেনিয়াম আগাছার বৃদ্ধি হয়ে গেছে যার আর এক নাম পাপিষ্ঠ, তাকে সংহার বিনাশ করে ধর্মপ্রাণ মানুষ যাতে সুন্দর ভাবে বেঁচেবর্তে থাকে তার ব্যবস্থা করেন। এই আসা, এর নাম অবতার। শাস্ত্রে আছে শত শতবার অবতার হয়েছেন তিনি। একবার তো মল খায় যে ওয়োর সেইরূপে অবতীর্ণ হতে হয় ওনাকে।

বিষ্ণুর যে দুটো অবতার হিন্দু জনমানসে সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধার পাত্র তার একটা রাম অন্যটা কৃষ্ণ। যে কালে রামচন্দ্র জন্মেছিলেন সবাই সে কালটার নাম দিয়েছে ত্রেতা যুগ বলে। ভগবান বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্র, দুষ্কৃতীদের বিনাশ আর ধর্ম সংস্থাপনার্থে যাঁর জন্ম, তাঁর হত্যালীলার শুরু হল এক নিরস্ত্র অবলা রমনী তারকা বধের মধ্য দিয়ে। এরপর বালি। সামনে যাবার সাহস ছিলো না, মহাধনুর্ধর, মর্যাদাবান রাম কাপুরুষের মত তাঁকে হত্যা করলেন আড়াল থেকে

নিরস্ত্র মেরে, যুদ্ধশাস্ত্রে যার অনুমোদন নেই। অস্ত্রহীন অনশনক্লিষ্ট মেঘনাদকে মারা হল অতর্কিত আক্রমণে। মহীরাবণকে মারা হল ধোকা দিয়ে। তরনী সেনের মত শিশুকেও ছাড়া হল না। এই সব কটা হত্যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এমন এক অনৈতিকতা, যা মানুষ করলে মেনে নেওয়া যায়, 'ভগবান অবতারকে' মানায় না।

রামচন্দ্রের জীবনে সবচেয়ে ঘৃণ্য জঘন্য নিন্দার অযোগ্য অপরাধ শম্বুক ঋষিকে হত্যা। কেন তাঁকে রামের হাতে মরতে হয়? কী এমন মারাত্মক দোষ করেছিলেন তিনি? জ্ঞান অন্বেষণ করেছিলেন। বেদ পাঠ করেছিলেন তিনি। এক নিচু জাতির মানুষ হয়ে প্রজ্ঞার পথে পা রেখেছিলেন। এই তাঁর অপরাধ। সবাই জানে শিক্ষা আনে চেতনা। সচেতন মানুষ কোন অন্যায় মাথা পেতে নীরবে মেনে নেয় না। তাই এক বিশাল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে অজ্ঞ, অন্ধ, মুর্খ বানিয়ে রাখার জন্য বর্ণ প্রভুরা বার বার চক্রান্ত করেছে। রামচন্দ্র অবতার (?) হয়ে হলেন সেই নোংরা বর্বরে অসভ্য খেলার অংশীদার।

এর পরের অবতার কৃষ্ণ। কুরু এবং পান্ডব দু'দল জ্ঞাতি ভ্রাতায় রাজত্ব নিয়ে বিরোধ। এর মধ্যে দেশের আপামর সাধারণ মানুষের কোন স্বার্থ নেই। রাজা যেই হোক রক্ত চোষে প্রজাদেরই। তাই যে রাজা হোক না হোক সে নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যথা থাকার কথা নয়। দুর্যোধন পান্ডবদের পুড়িয়ে মারার জন্য বারণাবত নামক স্থানে একটা জতুগৃহ নির্মাণ করে পান্ডবদের বাস করতে পাঠায়। বিদুর সে ষড়যন্ত্রের কথা পান্ডবদের নিকট ফাঁস করে দেন। এবার তো পান্ডবদের এখান থেকে পালাতে হবে। কিন্তু এমনি এমনি পালিয়ে গেলে তো হবে না। তাহলে দুর্যোধন চর লাগিয়ে পান্ডবদের খোঁজ খবর নেবে। সন্ধান পেয়ে গেলে আবার কোন বিপদে ফেলবে তা কে জানে। তাই এখানে এমন একটা কিছু করে রেখে যেতে হবে যাতে প্রমাণ হয় পান্ডবদের পাঁচ ভাই মা সহ পুড়ে মারা গেছে। এই দুষ্ট বুদ্ধি, ধূর্ত পরিকল্পনা অনুসারে পান্ডবগৃহে এমন এক দরিদ্র নিষাদ মহিলাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হল-যার পাঁচ পুত্র। বনবাসী আদিবাসী নিষাদ মানুষ। রাজ-আতিথ্য পেয়ে মনে করেছিল চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, নানাবিধ স্বাদু ভোজ্য পাওয়া যাবে। জানতো না মৃত্যু অপেক্ষা করে আছে তাদের জন্য। অতিথি নয়, পান্ডবদের দরকার ছয়টা লাশ। তাই রাতের খাবারের সাথে ধুতরা বিষ, ভাং, আফিম জাতীয় কোন নেশা দ্রব্য মিশিয়ে খাইয়ে দেওয়া

হলো তাদের। মা সহ পাঁচ ভাই বেহুঁশ হয়ে যাবার পর ঘর থেকে বাইরে আসার দরজা বন্ধ করে দিল পাণ্ডবরা। তারপর জতুগৃহে আগুন ধরিয়ে দিল নিজেরাই। জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেল ছয় জন নীচু জাতির মানুষ। যাদেরএই রাজায় রাজায় যুদ্ধে কিছু পাবার বা হারাবার ছিল না তাদেরই বলি দেওয়া হল উঁচু জাতির স্বার্থে।এরকম একদল হিংস্র ঘৃণ্য নির্দয় মানুষ যাদের সখা বন্ধু হিতাকাঙ্ক্ষী হলেন অবতার পুরুষ কৃষ্ণ। তিনি আর্ত বিপন্ন অসহায়, নিচু জাত, নিষাদদের রক্ষাকর্তা নন। রক্ষাকর্তা—পাপিষ্ঠ-পাষণ্ড পাণ্ডবদের।

ছয় নিষাদের মৃত্যু যদি বা মেনে নেওয়া যায়, কিভাবে মানা যায় মহাবীর, হিড়িম্বা পুত্র, ঘটোৎকচের মৃত্যুতে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দাম উল্লাস নৃত্য? তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়া যাক যে, ভীমের দ্বারা হিড়িম্বা ধর্ষিতা হয়নি। এক ভ্রাতৃঘাতীকে সে স্বেচ্ছায় সানন্দে দেহ দান করে গর্ভবতী হয়ে ছিলো। সেই হিড়িম্বার সন্তান ঘটোৎকচ। সে তো এসেছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবদের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য। কর্ণ একঘ্নী বান নির্মাণ করেছেন অর্জুনকে মারবার জন্য। যে কোন সূত্রে সেটা কৃষ্ণ জেনে ফেলেছে। এ বান একবারের বেশি মারা যায় না। সেটা জেনে কৌশলী ধূর্ত পাণ্ডবসখা যাতে অর্জুনের কোন ক্ষতি না হয়, সরল সাহসী ঘটোৎকচকে এগিয়ে দিল কর্ণের সামনে যুদ্ধ করতে। আর যখন কর্ণের বান বুকে নিয়ে ঘটোৎকচ মারা যাচ্ছে সে তার পাহাড় প্রমাণ শরীর নিয়ে কোন দিকে পড়বে সেটাও সে পাণ্ডবদের প্রধান যুধিষ্ঠিরের কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়ে তবে মাটিতে পড়ছে। কারণ সে তার বিশাল দেহ নিয়ে যে দিকে পতিত হবে দেহের চাপে বহু সেনা মারা যাবে, সেটা সে অন্তিম সময়েও ভুলে যায়নি। প্রাণ যাচ্ছে তবুও শেষ সময় খেয়াল রাখছে পিতৃপক্ষের যেন কোন ক্ষতি না হয়।

আর সেই অনার্য বীর যখন মারা যাচ্ছে, যারা মেরেছে সেই কর্ণ বা দুর্যোধন নাচলে তার একটা মানে বোঝা যায়। বোঝা যায় না কৃষ্ণ কেন নাচে। কিসে তার এত আনন্দ? শ্রীকৃষ্ণের এই উদ্দাম উল্লাস নৃত্যের কারণ কী জানতে চেয়েছিলেন যুধিষ্ঠির। তখন কৃষ্ণ বলেন যে — কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবরা যদি জিতেও যায়, এত বড় একজন মহাযোদ্ধা পরবর্তীকালে তাঁদের বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে। এবং সেটা শুধু পাণ্ডবদের একার নয়। সমস্ত আর্য সমাজের পক্ষে খুব একটা শুভ হবে না। সে বিপদ কেটে গেল বলে তাঁর এত হর্ষোল্লাস।

চিরকালই আর্য তথা ব্রাহ্মণ্যবাদী মানুষের এটাই একমাত্র উদ্দেশ্য, ছলে বলে কৌশলে যেভাবে পার অনার্যদের পায়ের তলে ফেলে রাখো। বিদ্যা বা বীরত্বে, সম্পদ বা সম্মানে কেউ যেন আর্যদের চেয়ে বড় হয়ে যেতে না পারে। সেই জন্য শম্বুককে মারা হয়, একলব্যের আঙুল কাটা হয়, অমৃত থেকে বঞ্চিত করা হয় দানবদের, ঘটোৎকচ এর মৃত্যুতে আনন্দ প্রকাশ করা হয় এবং এই শেষ কাজটা করেন অবতার কৃষ্ণ যাঁর শুধু উচ্চবর্ণ নয়, সমগ্র মানব জাতির মঙ্গলকারী হবার কথা ছিল।

এটা একটা বিড়ম্বনা যে নমঃশূদ্র সমাজের সবচেয়ে মহান মানুষ, যেমন-মানুষ এ জাতির মধ্যে আগে আর জন্মাননি। তিনি এক দীন হীন অপমানিত নীচ গোষ্ঠীকে দিয়েছেন আলাদা এক ধর্ম-সংস্কৃতি আত্মসম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার আদর্শ, অহংবোধ, গরিমা এবং অস্মিতা দর্শন। আমি কারো চেয়ে ছোট নই, কেউ আমার চেয়ে বড় নয়। একদল অশিক্ষিত মতুয়া ধর্ম প্রচারক সেই বিরাট আর মহান মানুষকে তুলনা করেছে সেই হীন ঘৃণ্য চক্রান্তকারী শূদ্র শত্রু রাম আর কৃষ্ণের সঙ্গে। হরিচাঁদ ঠাকুর নাকি এঁদের মতো এক অবতার। অবতারবাদ, এতো ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বানোনো ফাঁদ। মানুষকে ধোঁকা দেবার, বোকা বানাবার কৌশল। হিন্দু ধর্মের যে প্রধান দুটি বাহু বা স্তম্ভ তার একটা বেদ অন্যটা ব্রাহ্মণ। যে বেদের সারবত্তা স্বীকার করে না, ব্রাহ্মণের পায়ে প্রণত হয় না, সে হিন্দুই নয়। বুদ্ধদেব কোন দিন তা করেননি। কিন্তু বুদ্ধের মৃত্যুর পর সেই বুদ্ধকেই হিন্দু ধর্মের দশ অবতারের এক অবতার বানিয়ে ছেড়েছে ধূর্ত ধর্মব্যবসায়ীরা। যিনি তাঁর সারা জীবনে পূর্বজন্ম পরজন্ম নিয়ে কোন কথা বলেননি তাঁরই একশ পূর্বজন্মের গল্প ফেঁদে জাতক কাহিনী নাম দিয়ে বাজারে ছেড়ে দিল। এটা খুব পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের গুরু গোসাঁই -রা সেই ফাঁদে পা দিয়ে, ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী এক মহান মতুয়া ধর্মকে সেই ব্রাহ্মণদের বানানো ঘৃণ্য পথে নিয়ে যাচ্ছেন।

বলা হয়ে থাকে যে, হরিচাঁদ ঠাকুরের পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর নকি শিবের অবতার। এমনিতে মন্দিরে শিবের যে মূর্তি বানানো দেখা যায়, তার চেহারা পোশাক-আশাক দেখে এটা অনুমান করে নেওয়া যায় যে, তিনি আর্য সমাজের লোক ছিলেন না। কিন্তু তার প্রতাপ এবং 'দেব দেবতা' বলে কথিত আর্য

জনগোষ্ঠীর বার বার বিপদতারণ ভূমিকায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁরা শিবকে নিজেদের দেবতা বলে স্বীকার করে নেন এবং ব্রহ্মা বিষ্ণুর সমান সম্মান দেন।

সেই শিব বা মহাদেব মহাশয় সারা জীবনে এদেশের মূল নিবাসী মানুষের জন্য কোন্ উপকারটা করেছেন তা কে জানে। তিনি তাঁর আবিষ্কার করা মহা অস্ত্র পাশুপত খানা অনার্য কোন বীরকে নয়, দান করেছিলেন এক রমনীসহ পাঁচ নিরীহ নিষাদ হত্যাকারী, পান্ডব পক্ষের এক ক্ষত্রিয়কে। যার মূর্তি নির্মাণে বেশ্যার দরজার মাটি লাগে - মহাবীর মহিষাসুরের হত্যাকারী - দূর্গা নামক সেই মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন। আর রাবন রাজার সঙ্গে যা করেছিলেন তা তো একটা চরম বিশ্বাসঘাতকতা। বিপন্ন রাবন রাজাকে আশা-ভরসা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার সাথে লঙ্কায় যাবার সময় মাঝ পথ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। **এমন একজনের অবতার বলে নমঃশূদ্র সমাজের সবচেয়ে বড় হিতৈষীকে, গুরুচাঁদ ঠাকুরকে চালাবার চেষ্টা করা তাঁর সম্মান তো নয়ই, অপমান।**

আমি ধরে নিচ্ছি, বিষ্ণু বা শিব সম্বন্ধে যা বলেছি তা ভুল। ব্রাহ্মণ্যবাদের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য ব্রাহ্মণ দ্বারা লিখিত পুঁথি-পুস্তক গ্রন্থের কথাই সত্য। শিব, বিষ্ণু ভগবান। তো তা হলে আর একটা প্রশ্ন আছে - এই বিষ্ণু এবং শিব যখন নরদেহ ধারণ করে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষকে উদ্ধার করতে এলেন - আজও তারা উদ্ধার হল না কেন? দু'জন ভগবানের কাছে চল্লিশ কি পঞ্চাশ লক্ষ নমঃশূদ্র মানুষকে শিক্ষায় দীক্ষায়, খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসায়, চাকুরিতে 'উদ্ধার' করে দেওয়া কী এমন কঠিন কাজ ছিল? কেন আজ তারা আন্দামানে, দন্ডকারণ্যে, রেলবস্তি, খালপাড়, ফুটপাত, গাছতলায় পড়ে মরছে? গরু গাধার যা কাজ, পুরুষগুলো কেন ভ্যান টানছে, রিক্সা চালাচ্ছে? মেয়ে বউগুলো কেন যাচ্ছে বাবু বাড়ির বাসন মেজে বাসি ভাত রুটি আনতে? এদের কিশোরী কন্যাগুলো কেন পাচার হচ্ছে ভিন রাজ্যে? কেন মুখে রং মেখে দাঁড়াচ্ছে বৌবাজারের গলিতে?

এই জাতি উদ্ধার করার জন্যই তো ডবল ভগবান জন্ম নিয়েছিলেন। তবে দেশ ভাগের সময় বিষ্ণু তার চক্র, শিব তার ত্রিশূল নিয়ে কেন রুখে দাঁড়ালেন না? দুবৃর্ত্তরা যখন নমঃ মেয়েদের টেনে নিয়ে যাচ্ছিল কেন তাদের ঠেকালেন না?

আজ এ সব প্রশ্ন নিয়ে নতুন করে ভাববার সময় এসেছে। সময় এসেছে নতুন

করে বাস্তববাদী বিজ্ঞানমুখী বিশ্লেষণের নিরিখে মহান মতুয়া মতবাদকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করবার। কী দরকার আমাদের দুই শ্রেষ্ঠ মানবকে কারো অবতার বানাবার? সেই কাল তো আমরা কবে পার হয়ে এসেছি, যখন কিছু অশিক্ষিত ধান্ধাবাজ গুরু গোসাঁই ভুলভাল বলে সরল সিধা নমঃশূদ্র মানুষদের বোকা বানিয়ে ধর্ম ব্যবসার দোকান খুলে বসেছিল। তারাও কানে মন্ত্র দিয়ে শিষ্যের দল ভারি করে নিজের আখের গুছিয়ে নিতো। তারা কেউ কোন দিন ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে একটাও কথা বলেনি। ফলে শিষ্য মতুয়া হয়ে বছরে একবার ঠাকুর নগর ভ্রমণ করে গিয়ে বাদবাকি তিনশো চৌষট্টি দিন বসবাস করেছে বৈদিক রীতি রেওয়াজের মধ্যে। দুর্গাপূজা কালীপূজা ত্রিনাথের মেলা নিয়ে। এরই বিরুদ্ধে হরি-গুরুচাঁদ আজীবন বিদ্রোহ করে গেছেন।

এখন নমঃশূদ্র সমাজে বহু চিন্তাশীল মানুষ আছেন যাঁরা চেষ্টা করলে সাংগঠনিক ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে একদিকে যেমন আত্মিক বিকাশ (যা বহুকাল অবরুদ্ধ) এবং অন্যদিকে রাজশক্তির সমক্ষে নিজেদের শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে নিজের মানুষগুলোর সামাজিক জীবনে একটা পরিবর্তনের দিক নিশারী হতে পারেন।

এখন আর ভাগ্য ভগবান গুরু গোঁসাই নেতা অবতারের আশায় বসে থেকে লাভ নেই। কেউ কারো জন্য কিছু করে না। যে মানুষ নিজের জন্য নিজে কিছু করে না তার জন্য 'ভগবান'ও কিছু করেন না।

জিন, বুদ্ধি, জাতি, প্রগতি

তুষার চক্রবর্তী

মানব জিনোম প্রকল্পের আলোয় জাতিভেদের সনাতন তত্ত্ববিভ্রম এখন নিছক ধাপ্পা বলে প্রমাণিত হয়েছে। জাতি বিষয়ে হরেকরকম তথ্যবিভ্রান্তি শিক্ষিত (!) জাতিবাদী, বর্ণবাদীরা জনসমাজে থেকে থেকে নানা কায়দায় ছড়িয়ে দেয়। এতদিন জৈবপ্রকৃতি ও জিনের প্রভেদ তাদের কাছে ছিল একটা বড় ধরণের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক হাতিয়ার। বুজরুকি দিয়ে জিন বিষয়ক নানা রকম একপেশে এবং খণ্ডিত তথ্য এরা সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করার প্রয়াস চালাত। অজানাকে ব্যবহার করে জানাকে চাপা দেয়াটা অপবিজ্ঞানের চিরকালের স্বভাব। এ ক্ষেত্রে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বিজ্ঞান দিয়ে যেন-তেন প্রকারে গোঁড়ামিকে সমর্থন করার কৌশল। মানব জিনোম প্রকল্পের আলোয় সেই সব সুযোগ এখন চলে যেতে বসেছে। মানবসভ্যতা আর কিছু না হোক- অন্তত এই একটি কারণে জিনোম প্রকল্পের কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে রইল। মানব জিনোম প্রকল্প চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে — মানুষে মানুষে যে সব জিনগত প্রভেদ এবং বৈচিত্র্য বিদ্যমান তারা এমন ভাবে বিন্যস্ত মোটেই নয় যাদের জাতি বা বর্ণের বর্গে সাজানো সম্ভব। সুতরাং মানুষে মানুষে জাতি বা বর্ণভিত্তিক বিভাজন টানার যুক্তি যে জিনতত্ত্ব সম্মত মোটেই নয় সেটা এখন যুক্তিবাদীরা সকলেই মেনে নিতে বাধ্য।

কিন্তু, জাতিবাদ যে এত সহজে বিদায় নেবে না সেটা অচিরেই বোঝা গেল। বুদ্ধি, মেধা, প্রজ্ঞা, এদের চরিত্র যেহেতু এখনো ততটা সাদাকালোয় বর্ণিত করার উপায় নেই — জাতিবাদীরা সেই আলোআঁধারিতেই এখন আরো বেশি করে আশ্রয় নিয়েছে। আর এর পেছনে কলকাঠি নাড়ছে একগুচ্ছ ধর্মীয় সংগঠন এবং আরেকদল সামাজিক ফ্যাসিবাদী। অবশ্য এদের দুদলের ভাণ্ডারেই রয়েছে রাশি রাশি টাকা। এদের হয়ে বাদ্য বাজাবার জন্য কয়েকজন কপট বিজ্ঞানী তাই আজকাল অতিসক্রিয় হয়ে উঠেছেন। বেদনাদায়ক হলেও কথাটা সত্যি। এই ঘটনাপ্রবাহের দুটো-একটা উদাহরণ এখানে উপস্থিত করব।

জাতি এবং ইনটেলিজেন্স কোশেন্ট বা আই কিউয়ের সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাওয়া উচিত কিনা এরকম একটা বির্তক কিছুদিন আগে খুঁচিয়ে তোলে বৃটিশ বিজ্ঞানপত্র 'নেচার'। সুপরিচিত বামপন্থী স্নায়ুবিজ্ঞানী স্টিভেন রোজকে ওঁরা প্রথমে এই প্রশ্নটি করেন। অধ্যাপক রোজ কোনো রাখঢাক না রেখে একেবারে চাঁচাছোলা ভাষায় জানান যে, ওরকম গবেষণা চালানো অনুচিত — কেননা, সমাজ এবং বিজ্ঞান দুয়ের কোনটিই এরকম গবেষণায় বিন্দুমাত্র উপকৃত হবেনা। রোজ তাঁর বক্তব্য এত পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেন যে কোনো জিনতাত্ত্বিক বা নিউরোসায়েন্টিস্ট জোটাতে নেচার পত্রিকা ব্যর্থ হয়, যিনি স্টিভ রোজের বক্তব্য খণ্ডন করবেন। অবশেষে, তথাকথিত ভারসাম্য রাখার ছলে প্রতিপক্ষ খাড়া করা হয় কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মানব বিকাশ বিভাগের দুই অধ্যাপককে। এদের প্রকাশিত বক্তব্যে সবচেয়ে জোরালো যুক্তি ছিল একটাই। সেটা হল, যে কোনো বৈজ্ঞানিক বিতর্কে একপক্ষের দিকে যদি সকলেই ঝুঁকে পড়ে তাহলেও চিন্তার ক্রমবিকাশের পথ খোলা রাখার জন্য নাকি বিপরীত একটা মত যেভাবেই হোক সেখানে রাখা দরকার। আর তার উদাহরণ দেবার জন্য এঁরা ব্যবহার করেন সোভিয়েত ইউনিয়নে স্তালিনযুগে লাইসেংকোর উত্থানের ঘটনা এবং শিরোনামে ঘোষণা করেন যে-কোনো মূল্যে বিজ্ঞানের সত্য সন্ধান করার অঙ্গীকার।

কর্নেলের অধ্যাপকদ্বয় একথা তালেগোলে গুলিয়ে দিতে চান যে — সেই সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির নিজেদের দেশ ও সমাজের সববিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার। যদিও স্তালিন বিজ্ঞানের সত্যকে শ্রেণীনিরপেক্ষ বলে স্বীকার করেন - এবং লাইসেংকোর বিজ্ঞানকে শ্রেণীগত ছাপ্পামারার ত্রুটি (একটি দলিলে) নিজের হাতে একাধিকবার সংশোধন করেন, তবু দলের শিলমোহর থাকায় ঐ সময় সোভিয়েত ইউনিয়নে লাইসেংকো বিরোধীরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছিলেন। এটা যে সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতিহাসের একটি অমার্জনীয় এবং কলঙ্কজনক ত্রুটি — সেটা বামপন্থীরা প্রায় সকলেই পরবর্তীকালে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকার করেছেন।

কিন্তু আমাদের জানতে ইচ্ছে করছে যে আজকের পশ্চিমের দুনিয়ার ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ইউরোপীয় দেশগুলির অবস্থাও কী কর্নেলের এই দুই অধ্যাপক সেই

স্তালিনযুগের সঙ্গে তুল্যমূল্য বলে মনে করেন? এই তুলনাটাই তো এখানে অনুচিত, এবং অবিশ্বাস্য। ডুবন্ত মানুষের খড়খুটো আঁকড়ে বাঁচবার প্রবাদটি বোধহয় এখানে আরেকবার প্রমাণিত হল। আমরা কিন্তু আজকের পশ্চিম দুনিয়ার এতটা অধঃপতন হয়েছে বলে এখনো মনে করি না। আসলে, মিথ্যাচার এবং অন্যায়কে গায়ের জোরে সমর্থন করতে গেলেই এইরকম ভুল হয়। এই ভুলের উৎসে রয়েছে শ্রেণীগত ক্ষুদ্রস্বার্থ — পশ্চিমের মুক্ত সমাজে যার অবাধ বিকাশের সুযোগ আছে। সুতরাং, জাতিবাদ পশ্চিম থেকে বিদায় নিয়েছে একথা মনে করারও কোনো কারণ নেই।

অ্যারিস্টটলের একটি বচন ছিল : গোড়ার একটা ছোট্ট ভুল শেষে ভুলের পাহাড় তৈরি করে। জাতিভেদ বিষয়ে এই কথাটা একেবারে বর্ণে বর্ণে খাঁটি। মানুষের মধ্যে জাত, শ্রেণী এবং বর্ণভিত্তিক বহুধরনের সামাজিক বর্গীকরণ বহুদিন যাবৎ প্রচলিত ছিল। এরা এখন সমাজে বহুরূপে ছড়িয়ে আছে। জৈবপ্রবৃত্তি, বিশেষত জিনের ওপর জাতিবাদকে দাঁড় করাবার প্রচেষ্টা তার একটা রূপ। পাশাপাশি, চলছে জাতিভেদের মধ্যে বুদ্ধিসত্তার প্রভেদ খুঁজে বার করার অপচেষ্টা। এদের দিয়ে শোষণ এবং আরো নানারকমের সামাজিক উৎপীড়নজাত অন্যায়কে কেবল যে চাপা দেওয়া যায় তাই নয় — সমাজের বঞ্চিত এবং নির্যাতিতদের মানবাধিকার লুঠ করার প্রক্রিয়াও অব্যাহত রাখা যায়। থাকবন্দি সমাজকে ন্যায়সঙ্গত বলে জাহির করা যায়। কেননা, বুদ্ধিমত্তাই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে সর্বত্র বিবেচিত হয়ে আসছে। প্রায় একই কায়দা লিঙ্গবৈষম্যকে যুক্তিগ্রাহ্য বলে চালাবার জন্যেও কাজে লাগানো হয়। আর, ঠিক সেই কারণেই জীববিজ্ঞানীদের এসব বিষয়ে সতর্ক থাকাটা তাঁদের একেবারে প্রাথমিক সামাজিক কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। কিন্তু এই সচেতনতা কি এখনো যথেষ্টমাত্রায় বিকশিত হয়ে উঠেছে? আগের তুলনায় অবস্থাটি খানিকটা ভালোর দিকে এগোলেও - সমস্যা নির্মূল হয়নি।

আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে এমনকি স্বয়ং ডারউইন শ্বেতকায় অ্যাংলো-স্যাক্সনেরা যে দুনিয়ার সব চাইতে বুদ্ধিমান শ্রেণীর মানুষ এটা বিশ্বাস করতেন। এর জন্য যে কোনো প্রমাণ দাখিল করা দরকার — সেটাও তাঁর মনে

আসেনি সেদিন। বিশ্বাস না হলে, ওঁর লেখা *ডিসেন্ট অব ম্যান অ্যান্ড সিলেকশন ইন রিলেশন টু সেক্স* খুলে যে কেউ এক্ষুনি মিলিয়ে দেখে নিতে পারেন। যদিও ডারউইন মানুষকে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে একটি প্রজাতি বলে মনে করতেন এবং ছিলেন দাসপ্রথার ঘোরতর বিরোধী, তবু সমকালীন সামাজিক মতের ঊর্ধ্বে তিনিও সবসময়ে উঠতে পারেননি। এর জন্য ডারউইনের চেয়েও অনেক বেশি দায়ী সেকালের সমাজ। কিন্তু, এ যুগে শিক্ষিত সাধারণ মানুষ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়ে, এবং তার অভিঘাত বিষয়ে সচরাচর অনেক পরিণত মনের পরিচয় বহন করেন। আর, একথা এখনো না বুঝলে বিজ্ঞানীদের বিপাকে পড়তে হয়। ঠিক এরকম সংঘাতের কিছু কিছু ঘটনা বিজ্ঞানী ও গবেষকদের নিয়ে এখন মাঝেমাঝেই ঘটছে।

ডাবল হেলিক্স আবিষ্কারের সূত্রে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী জেমস ওয়াটসন কয়েক বছর আগে জাতি, জিন এবং বুদ্ধিসত্তার ওপর একটি আলগা মন্তব্য করলে তা তাঁর চরিত্রে এক দোয়াত কালি ফেলে দেয়। বৃদ্ধবয়সে কোল্ড স্প্রিং হারবার ল্যাবরেটরির অধিকর্তার পদটিও তাঁকে খোয়াতে হয়। নানারকম বির্তকিত মন্তব্য করে শোরগোল তোলাটা ওয়াটসনের স্বভাবজাত। এক্ষেত্রে, একটি বৃটিশ সংবাদপত্রকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলে বসেন যে, যাঁদের গায়ের চামড়া কালো তাদের বুদ্ধিসুদ্ধি কম এবং তাই সাদাদের চেয়ে তাদের চাকরি পাবার দক্ষতাও কম। জাতি ও লিঙ্গ বিষয়ে ঠেস দিয়ে বেশ কিছু বির্তকিত কথা ওয়াটসন আগেও বলেছেন। তবে এত খোলাখুলি নয়। একবার বলেছিলেন যে, তিনি চান জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পৃথিবীটা সুন্দরী মেয়েতে বোঝাই করে দিক। একবার বলেছিলেন যে — যৌনতাড়না চামড়ার রংয়ের ওপর নির্ভর করে; যার নিহিতার্থ ছিল — কালোরা যৌন তাড়না বেশি থাকার জন্য ধর্ষণ জাতীয় অপরাধে বেশি লিপ্ত হয়। আমেরিকায় হলে, তাঁর মন্তব্য মার্কিন সংবাদমাধ্যম কায়দা করে সামলে দিত। কিন্তু দেশের বাইরে ওয়াটসনের উচ্চারিত এই মন্তব্য প্রবল ঝড় তুললো। নিজের লেখা একটি বইয়ের প্রকাশ উপলক্ষে তিনি তখন লন্ডনে। ওয়াটসন ক্ষমা চেয়ে এবং ভুলস্বীকার করে রেহাই পেলেন না। শেষে বাধ্য হয়ে স্বীকার করলেন যে এই মতামত প্রমাণ করার মতো কোনো

তথ্য তাঁর হাতে নেই। বললেন — বিজ্ঞান এই কথা বলে না। তবু, কর্মসূচী বাতিল করা হল। পত্রপাঠ তাঁকে ফিরতে হল আমেরিকায় এবং সেখানে তাঁকে পদ থেকে অপসারিত করা হল। প্রমাণিত হল, বিজ্ঞানের স্বাধীনতার স্বার্থে এই রকম জাতিবাদী মনোভাবকে বেপরোয়া প্রশ্রয় দেবার যুগ শেষ হয়ে গেছে।

মানবজাতির মধ্যে জিন বৈচিত্র্য সন্ধানের ছলে এই ধরণের অপকর্মের যে সব তৎপরতা গত শতাব্দীর শেষে মাথা তোলে তাকে যেন আজ খানিকটা সংযত করা গেছে। প্রান্তিক এবং আদিবাসী জনজাতিগুলির রক্তসংগ্রহ করে জিন পরীক্ষার হিড়িক তখন উঠেছিল। দক্ষিণ আমেরিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলিতে আদিবাসীরা এদের নাম দেন ভাম্পায়ার প্রজেক্ট আর সম্মিলিত ছিছিক্কারে এদের পাততাড়ি গুটোতে হয়েছিল। জিন বৈচিত্র্যের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান তাতে থামেনি। বরং , এর ফলে অনেক সংযত এবং সর্তক হয়ে তা করছেন বিজ্ঞানীরা। সুতরাং, যেখানেই হোক আর যিনিই করুন, জাতিবাদী মানসিকতার লক্ষণ দেখলে তার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ তোলার প্রয়োজন রয়ে গেছে। বিজ্ঞানের স্বার্থেই জাতিবাদ বর্ণবাদকে প্রতিহত করতে হবে, চিহ্নিত করতে হবে এর সবরকম উৎস। এমনকি নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী হলেও — এ ব্যাপারে তাঁকে ছাড় দিলে চলবেনা। মানব প্রগতির এটা অন্যতম লক্ষণ চিহ্ন।

সবশেষে আরো একটা কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। বর্ণাশ্রম প্রথাও জাতিবাদের শিকড়ে ভারতীয় সমাজের এত গভীরে ছড়িয়ে আছে যে ভারতে মানবপ্রগতির পথ পরিষ্কার করতে আমাদের অনেক বেশি সচেতন ও সক্রিয় হতেই হবে। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের একথা ভুললে চলবেনা।

চণ্ডাল বনাম নমো

সুনীল কুমার রায়

'চণ্ডাল' শব্দটি ঋগ্বেদে নেই। যজুর্বেদে একবার মাত্র নরবাচক অথবা জনগোষ্ঠীবাচক শব্দরূপে উল্লেখিত হয়েছে।

" অগ্নয়ে পীবানং পৃথিবৈ পীঠসর্পিনং কমবে চণ্ডালমন্তরীক্ষায় বংশনর্তিনং দিবে খলতিং

সূর্যায় হর্যক্ষং নক্ষত্রেভঃ কির্মিরং চন্দ্রসমে কিলাসযত্নে শুক্লং পিঙ্গাক্ষং রাত্রৈ কৃষ্ণং পিঙ্গাক্ষং ।।" [শুক্ল যজুর্বেদঃ ত্রিংশ অধ্যায়ঃ, শ্লোক 21]

অর্থাৎ, (বলিদানের জন্য)—

অগ্নির উদ্দেশ্যে মোটা মানুষ, পৃথিবীর উদ্দেশ্যে পঙ্গু, বায়ুর উদ্দেশ্যে চণ্ডাল, অন্তরীক্ষের উদ্দেশ্যে বংশদণ্ডের উপর নৃত্যকারী, আকাশের উদ্দেশ্যে টেকো মানুষ, সূর্যের উদ্দেশ্যে সবুজ চোখো মানুষ, নক্ষত্রের উদ্দেশ্যে শ্বেতী বিশিষ্ট ব্যক্তি, চন্দ্রের উদ্দেশ্যে কুষ্ঠ রোগী, দিনের উদ্দেশ্যে শ্বেতবর্ণের হলুদ চোখো লোক এবং রাত্রের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণবর্ণের হলুদচোখো লোকই প্রশস্ত।

এই শ্লোক ও এর পরবর্তী শ্লোক থেকে বড় জোর ধারণা করা যায় যে আনকোরা নূতন ' চণ্ডাল' শব্দটির দ্বারা ব্রাহ্মণ বা শূদ্রবর্ণের মানুষেরা সূচিত হচ্ছেন না, কিন্তু অন্য কারা সূচিত হচ্ছেন তা মোটেই বোঝো যাচ্ছে না।

এখন প্রশ্ন হলো —

একান্ত নূতন শব্দটিকে ঋষি এইভাবে অবিশেষিত রেখেছিলেন কেন?

প্রশ্নটির একমাত্র সম্ভাব্য উত্তর —

'চণ্ডাল' শব্দে যাঁদের তিনি নির্দেশ করতে চেয়েছিলেন তৎকালে তাঁরা ছিলেন এমনই এক শক্তিশালী নরগোষ্ঠীর বা জনগোষ্ঠীর মানুষ যে সেই প্রবল প্রতিপক্ষীয়দের নির্দিষ্টভাবে সনাক্ত করার সাহস তাঁর ছিল না।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এই যে, যজুর্বেদের কালে 'চণ্ডাল' শব্দটি অবিশেষিত থাকলেও তার পরবর্তীকালে তাতে ক্রমান্বয়ে নিন্দাবাচক বিশেষণ যুক্ত হয়েছিল। যেমন — ছান্দোগ্য উপনিষদে (V.10.7) বোঝা গেল যে, ঐ শব্দে কোন এক 'হীনজন্মা' নরগোষ্ঠীর মানুষরাই চিহ্নিত হচ্ছেন। অর্থাৎ বৈদিক ভাষার এবং যাগ-যজ্ঞের সংস্কৃতির ধারক বাহকদের প্রবল বিরোধী ' রাক্ষস', 'দানব', 'মায়াবীদস্যু' ইত্যাদি ব্রাহ্মণ্য অভিধায় ভূষিত শক্তিশালী সম্পদস্রষ্টা প্রাগার্য কোন এক নরগোষ্ঠীর মানুষেরা 'চণ্ডাল' শব্দ দ্বারা সূচিত হচ্ছেন।

মৌর্য সাম্রাজ্য ব্রাহ্মণ পুষ্যমিত্রের অধিকারে এলে তিনি অব্রাহ্মণ বর্ণের মানুষদের সামাজিকভাবে অবনমন ঘটান। সামাজিক জীবনের দৈনন্দিন অনভিপ্রেত কাজকর্ম রাষ্ট্র ক্ষমতার বলে যাদের দিয়ে করানো হলো, তাদের মানবিক সত্ত্বা হরণ করার লক্ষ্যে রচিত হলো শাস্ত্র এবং ব্রহ্মণ্য চেতনায় যা কিছু ঘৃণ্য কাজ তা যাঁরা করতে স্থায়ীভাবে বাধ্য হলেন তাঁরা হলেন ঘৃণ্য, তাঁরা হলেন চণ্ডাল।

"শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চণ্ডালাশ্চধর্মো নৃণাম।
বৈশ্যরাজন্য বিপ্রাসু জায়ন্তে বর্ণসঙ্করা।।" 12 ॥
" চণ্ডাল শ্বপচাপাস্ত বহির্গ্রামাৎ প্রতিশ্রয়ঃ।
অপপাত্রাশ্চ কর্তব্য ধনমেষাং শ্বগর্দভম ।।"51 ॥
বাসাংসি মৃতচেলানি ভিন্নভাণ্ডেষু ভোজনম।
কার্ষ্ণায়সলঙ্কারঃ পরিব্রজ চ নিত্যশ্চ ।। 52 ।।
ন তৈঃ সমবয়িচ্ছেৎ পুরুষো ধর্মাচরণ।
ব্যবহারোমিথস্তেষাং বিবাহঃ সদৃশৈঃ সহ ।। 53 ॥
অন্নমেষাং পরাধীনং দেয়স্যুন্নিভাজনে।
রাত্রৌ ন বিচরেযুস্তে গ্রামেষু নগরেষু চ ।। 54 ।।

দিবা চরেষু কার্যার্থং চিহ্নিতা রাজশাসনৈঃ।
অবান্ধবং শবঞ্চৈব নির্হরেযুরিতি স্থিতি ।। 55 ।।
বধ্যাংশ্চ হন্যুঃ সততং যথাশাস্ত্রং নৃপাজ্ঞয়া।
বধবাসাংসি গৃহীযু শয্যাশ্চাভরণানি চ ।। 56 ।। [মনুস্মৃতি]

অর্থাৎ শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে জারজ সন্তানরূপে চণ্ডালের জন্ম। তার আশ্রয় গ্রামের বাইরে। অপপাত্র সে জলপান ও অন্নভোজন-এর জন্য ব্যবহার করবে। কুকুর এবং গাধাই তার সম্বল। তার পরিধেয় হলো শববস্ত্র আর অলঙ্কার হলো লোহার তৈরি। তার বিয়ে স্বজাতির সঙ্গেই হবে। তার অন্ন পরাধীন। দিবেলায় গ্রামে বা শহরে তার প্রবেশ নিষেধ, দিনে নির্দিত চিহ্ন বহন করে সে কাজে বেরোবে, অনাথ শব গ্রামের বাইরে বয়ে নিয়ে যাবে এবং রাজাদেশে বধ্য ব্যক্তিকে বধ করবে। কিন্তু একটি নরগোষ্ঠীকে সামগ্রিকভাবে নিকৃষ্টতে পরিণত করারএমন ব্রাহ্মণ্য অপচেষ্টা তেমন সফল হয়নি। যেমন, মহাভারতের কথা ঃ

"In Mahabharata the Chandals are introdruced as hired assassins, whose humanity, however, revolts against putting an innocent boy to death." [H.H. Risley, The Tribes and Castes of Bengal I, p-184]

চূড়ান্ত অমানবিক প্রবৃত্তিবিশিষ্ট ব্রাহ্মণেরা উত্তর ভারতে কালের 'চণ্ডাল' গালিতে বিদ্ধ করেছিলেন অথবা বিদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। কারণ, 1872 খ্রিষ্টাব্দে সেন্সাস শুরু হওয়ার সময়ে কর্মে নিযুক্ত খোদ ব্রাহ্মণ কর্মীরাও সমগ্র উত্তর ভারতে ঐ নামের কোন জাতিবর্ণের মানুষকে শনাক্ত করতে পারেননি। [H.H. Risley, The Tribes and Castes of Bengal I, p-184]

ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্র সাহিত্যের সূতিকাগার উত্তর ভারতে 'চণ্ডাল' বলে কোন জাতিবর্ণের সন্ধান না পাওয়া গেলেও তৎকালীন বাঙলায় (অর্থাৎ বর্তমানের

আসাম, ত্রিপুরা, বংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যায়) বিশাল শক্তিশালী নমো জাতিকে গণনা কর্মীরা ঐ নামে শনাক্ত করেছিলেন। কারণ, পাল আমল থেকেই প্রশাসনিক পর্যায়ে ঐ নামে ধারাবাহিকভাবে তাঁরা উল্লেখিত হয়ে আসছিলেন। তবে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই, যে সেই নম বা নমো জাতির (সর্বপ্রকার পেশায় পারদর্শিতা, নিজস্ব মতাদর্শ, সৃজনশীল সংস্কৃতি এবং প্রতিবাদী মৌলিক চরিত্র বৈশিষ্ট্যর বিচারে তাঁরা একটি জাতিই।) মধ্যে মনুস্মৃতির বিশেষণগুলির কোনও দূরতম আভাস পর্যন্ত ছিল না ও আজও নেই, আর সেই বীর্যবান মানুষেরা 'চণ্ডাল' শব্দটিকে কোনদিনই তাঁদের জাতির নাম বলে স্বীকার করেননি। আবহমান কাল ধরে তাঁরা নিজেরা 'নম' বা 'নমো' জাতি নামে পরিচয় দিয়ে চলেছেন। খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর ব্রাহ্মণ্য নিন্দাবাদ, ইসলামের রাজশক্তির যুগপৎ প্রলোভন ও নির্যাতনের ঘোর দুর্দিনেও তাঁরা 'নম জাতি' নাম এবং তাঁদের ঐহিত্যগত বস্তুবাদী লোকায়তিক মতাদর্শ 'নম মত' কে সগর্বে বহন করে জাতির অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছিলেন। [রামাই পণ্ডিত , শূন্যপুরাণ, সম্পাদক ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়, পৃ:55,151,200,210। কার্মা কে.এল.এম.প্রা লিমিটেড; কলকাতা, 1977]

"বল্লাল চরিতে" বর্ণিত ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধ ধর্মের বিরোধী এবং লোকায়তিক বস্তুবাদী বিশাল জনসমষ্টি যে সেন আমলের সংগ্রামী নমোজাতিকেই নির্দেশ করছে তা আমরা সহজেই বুঝে নিতে পারি। [ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত, বাঙ্গলার ইতিহাস, পৃ 43]

অষ্টম শতাব্দীতে ধর্মপালের নেতৃত্বে চালিত পাল-রাষ্ট্রকূট যৌথবাহিনীর কাছে বানগড় দুর্গ এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হারিয়ে গৌড়-পুণ্ড্রের ঐতিহ্যগত লোকয়তিক বস্তুবাদী নমোজাতি নিজস্ব মতাদর্শ আর স্বাতন্ত্র্য জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। [H.H.Risley, The Tribes and Castes of Bengal I, P 185]

ব্রিটিশ আমলে নিজেদের জাতির নাম পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁরা যে দুর্বার

আন্দোলন সংঘটিত করেছিলেন তা আমাদের বিস্মিত করে। এই আন্দোলনের দাবি ছিল—

নমোদের সম্মানিত জাতিরূপে স্বনামে স্বীকৃতি দিতে হবে, অন্যথায় বিরোধিতাকারীদের সামাজিকভাবে বয়কট করা হবে।

স্বাভাবিক কারণেই ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি জাতিবর্ণের অভিজাত হিন্দু ও মুসলমানেরা নমোদের দাবির বিরোধিতা করেছিলেন আর তার ফলে তাঁদের আন্দোলনও তীব্র আকার ধারণ করেছিল। সেই আন্দোলনের গভীরতা সম্পর্কিত একটি সরকারি রিপোর্টের অংশ বিশেষ এখানে পেশ করা হল -

" ..... so complete was the strike that about four months after its commencement, the Magistrate of Faridpur, in course of his tour of the affected areas, found the fields ..... untilled, the houses unthatched and not a Chandal in the service of Hindu or Mahamedan ....."

[District of Faridpur to Commissioner of Dacca Division, 8 April, 1873. GB, Judicial, May 1873. Progs No. 57, WBSA.]

এই অবস্থা শুধু ফরিদপুর জেলায় সীমাবদ্ধ ছিল না। যশোহর, খুলনা, বরিশাল, ঢাকা, ময়মনসিং, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, চব্বিশ পরগণা, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার নমোদের ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলেও সৃষ্টি হয়েছিল।

যে নামে নিজেদের জাতির পরিচয় দেওয়ার জন্য বিপুল সংখ্যক মানুষের এমন প্রতিজ্ঞা সেই 'নম' বা 'নমো' শব্দের উৎস কী ও তা কত প্রাচীন?

Jewish Encyclopedia- এর সাক্ষ্য থেকে জানা যাচ্ছে যে 'নম' নরগোষ্ঠীর চতুর্থ শাখা এখন থেকে 7000 বৎসর পূর্বে থিবস নগরীর পত্তন করেছিলেন। ঐ নরগোষ্ঠীর প্রথম, দ্বিতীয় ওতৃতীয় শাখার অস্তিত্ব অবশ্যই আরও বহু প্রাচীন কালের ঘটনা। তাঁরা সেই আদিমকাল থেকেই দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার কালাহারি ও নমিব মরুভূমিদ্বয়ের মধ্যবর্তী বৃহৎ নমভূমিতে (Great Namaland) বসবাস করে চলেছেন। তাঁরা নমভাষায় (Nama Language) কথা বলেন।

[Encyclopedia Britanica] প্রাকৃতিক ভূভাগ বৃহৎ নমভূমি (
Namaland) এখন নামিবিয়া, বৎসোয়ানা আর দক্ষিণ আফ্রিকার
হয়েছে। [The Concise Longman School Atlas : Continent
(Physical)]

থিবস নগরীর প্রতিষ্ঠাতারা যে পরবর্তীকালে মেহেরগড়ে তৃতীয় স্তরে
3800 খ্রিষ্টপূর্বাব্দে নগরায়নের উপাদানমিশ্রিত কৃষিসভ্যতা গড়ে তুলে
এবং তা কোটদিজি পর্ব সহজে অতিক্রম করে মহেজোদারো হরপ্পা স
উন্নীত হয়েছিল। [Jonathan Mark Kenoyer, Cultures and Soc
of Indus Tradition. Romila Thapar and Othrs, India: Histo
Beginnings and the Concept of the Aryan, p 53] যজুর্বেদের
প্রাচীন ঋগ্বেদেই 'নম' নরগোষ্ঠী আপন সত্ত্বা নিয়ে ভাস্বর হয়ে আছেন।

" যুধ্যাযুধমুপ ঘেদেষি ধৃষ্ণুয়া পুরাপুরংসমিদং হংস্যোজসা।

নম্যা যদিন্দ্র সখ্যা পারবতি নিবর্হয়ো নমুচিংনাম মায়িনম্।। [ঋগ্বেদস
1.53.7]

(হে ইন্দ্র! তুমি শত্রু বিনাশকরূপে এক যুদ্ধস্থল থেকে আর এক যু
গমন কর, তুমি বলদ্বারা নগরের পর নগর ধ্বংস কর। তুমি এক অকপট নম্য
সাহায্যে দূর দেশের নমুচি নামক এক মায়াবী দস্যুকে বধ করেছ।)

এই ঋকের "নম্যা সখ্যা" সম্পর্কে সায়ণ এইভাবে টীকা জুড়ে দিয়েছে

'শত্রুষু নমনশীলেন সখ্যা সহায়ভূত বজ্রেণ।' - সায়ণ (নমনশীল – ন
অন্ + অ + শীল)

অর্থাৎ বজ্র যেমন ইন্দ্রের একান্ত সহায়ভূত ঠিক তেমনিই এক ব্যক্তি ঘো
অশীল নমকুলে জন্মেও ইন্দ্রের অকপট সহায়ভূত সখা হয়েছেন।

আলোচ্য ঋকটিতে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে। যেমন —

১) নম নরগোষ্ঠী ঋগ্বেদে স্বনামে উল্লেখিত হয়েছেন।

২) বিশেষ শিক্ষার গুণে নমুচি যে উন্নত যুদ্ধকৌশলে রপ্ত ছিলেন

ইন্দ্র সখাটিও সেই যুদ্ধ কৌশলে রপ্ত ছিলেন, তবে সেই
কৌশল তাঁদের অধিগত ছিল না।

৩) দুই দূরপ্রান্তের দুই যোদ্ধার একই কূটকৌশলে যুদ্ধের অভিন্ন শিক্ষা
ঐতিহ্যের সূত্রব্যতীত সেই যুগে অন্য কোন ভাবে অর্জন করা
সম্ভব ছিল না। সুতরাং ইন্দ্রসখাটির নমনরগোষ্ঠীগত পরিচয় নমুচির
পরিচয়কেও সূচিত করছে।

৪) ঋগ্বেদের ঋষিরা নমবীরদের মায়াবী, দস্যু, দানব, রাক্ষস ইত্যাদি
বলতেন।

৫) বেদপন্থা এবং নমুচি বহুদূরবর্তী দুই দেশে বাস করতেন। এতে প্রমাণিত
হয় যে, নম নরগোষ্ঠীর মানুষেরা ভারতের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে নানা জাতি
গোষ্ঠীর সঙ্গে বাস করতেন।

৬) আপন নরগোষ্ঠীর উন্নত শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিসর্জন দিয়ে নম
উপসত্বভোগীরা মতাদর্শচ্যুত হয়ে গিয়েছিলেন। ইন্দ্রের বজ্রতুল্য
সখাটিসহ যদু, তুর্বা, অনু, পুরুরা তো সেই উপসত্বভোগীদেরই

আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে, ঋগ্বেদে নমনরগোষ্ঠীর বস্তুবাদী
মতাদর্শেরও পরিচয় আছে। তাই ঋষিরা তাঁদের রাক্ষস, দানব,
পণি প্রভৃতি নামে উল্লেখ করে যথাক্রমে যজ্ঞবিরোধী (1.29.13, 1.33.4-
5, 1.10, 7.6.3, 8.70.11 ইত্যাদি ঋকে), ব্রাহ্মণবিরোধী (2.22.4, 4.16.9
ইত্যাদি ঋকে) এবং দেবতাবিরোধী (5.42.9, 8.70.11, 10.38.3, 10.182.3
ইত্যাদি ঋকে) এবং অমন্ত্র। অর্থাৎ যাঁরা প্রমাণ বা 'যুক্তিব্যতীত কোন কিছুকে
মানতে চান না (10.22.8) বলে চিহ্নিত করেছেন। এর দ্বারা নম নরগোষ্ঠীর
দৃশ্যমান জগৎ-বস্তু, ব্যক্তিত্ব, সম্পদ সৃষ্টি এবং তার সদ্ব্যবহারের পারদর্শিতা
এবং ঋগ্বেদের সম্বন্ধনির্ণয়ে ব্যাপৃতবস্তুবাদী লোকায়তিক মতাদর্শপুষ্ট উন্নত
পরিচয়ও পাওয়া যাচ্ছে।

[Encyclopedia Britanica] প্রাকৃতিক ভূভাগ বৃহৎ নমভূমি (Great Namaland) এখন নামিবিয়া, বৎসোয়ানো আর দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। [The Concise Longman School Atlas : Continent Africa (Physical)]

খিবসা নগরীর প্রতিষ্ঠাতারা যে পরবর্তীকালে মেহেরগড়ে তৃতীয় স্তরে 4300-3800 খ্রিষ্টপূর্বাব্দে নগরায়নের উপাদানমিশ্রিত কৃষিসভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন এবং তা কোটদিজি পর্ব সহজে অতিক্রম করে মহেঞ্জোদারো হরপ্পা সভ্যতায় উন্নীত হয়েছিল। [Jonathan Mark Kenoyer, Cultures and Societies of Indus Tradition: Romila Thapar and Othrs, India: Historical Beginnings and the Concept of the Aryan, p 53] যজুর্বেদের তুলনায় প্রাচীন ঋগ্বেদেই 'নম' নরগোষ্ঠী আপন সত্তা নিয়ে ভাস্বর হয়ে আছেন।

" যুধাযুধমুপ যেদেষি ধৃষ্ণুয়া পুরাপুরংসমিদং হংস্যোজসা।

নম্যা যদিন্দ্র সখ্যা পরাবতি নিবর্হয়ো নমুচিংনাম মায়িনম্।। [ঋগ্বেদসংহিতা 1.53.7]

(হে ইন্দ্র! তুমি শত্রু বিনাশকররূপে এক যুদ্ধস্থল থেকে আর এক যুদ্ধস্থলে গমন কর, তুমি বলদ্বারা নগরের পর নগর ধ্বংস কর। তুমি এক অকপট নমসখার সাহায্যে দূর দেশের নমুচি নামক এক মায়াবী দস্যুকে বধ করেছ।)

এই ঋকের "নম্যা সখ্যা" সম্পর্কে সায়ণ এইভাবে টীকা জুড়ে দিয়েছেন -

'শত্রুষু নমনশীলেন সখ্যা সহায়ভূত বজ্রেণ।' - সায়ণ (নমনশীল = নম্ + অন্ + অ + শীল)

অর্থাৎ বজ্র যেমন ইন্দ্রের একান্ত সহায়ভূত ঠিক তেমনিই এক ব্যক্তি ঘোরশত্রু অশীল নমকুলে জন্মেও ইন্দ্রের অকপট সহায়ভূত সখা হয়েছেন।

আলোচ্য ঋকটিতে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে। যেমন —

১) নম নরগোষ্ঠী ঋগ্বেদে স্বনামে উল্লেখিত হয়েছেন।

২) বিশেষ শিক্ষার গুণে নমুচি যে উন্নত যুদ্ধকৌশলে রপ্ত ছিলেন নম

নরগোষ্ঠীচ্যুত ইন্দ্র সখাটিও সেই যুদ্ধ কৌশলে রপ্ত ছিলেন, তবে সেই যুদ্ধকৌশল ইন্দ্রের অধিগত ছিল না।

৩) দুই দূরপ্রান্তের দুই যোদ্ধার একই কূটকৌশলে যুদ্ধের অভিন্ন শিক্ষা নরগোষ্ঠীগত ঐতিহ্যের সূত্রব্যতীত সেই যুগে অন্য কোন ভাবে অর্জন করা সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং ইন্দ্রসখাটির নমনরগোষ্ঠীগত পরিচয় নমুচির নমনরগোষ্ঠীগত পরিচয়কেও সূচিত করছে।

৪) ঋগ্বেদের ঋষিরা নমবীরদের মায়াবী, দস্যু, দানব, রাক্ষস ইত্যাদি নামে উল্লেখ করতেন।

৫) ইন্দ্রসখা এবং নমুচি বহুদূরবর্তী দুই দেশে বাস করতেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, নম নরগোষ্ঠীর মানুষেরা ভারতের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে নানা জাতি গোষ্ঠী নামে বসবাস করতেন।

৬) আপন নরগোষ্ঠীর উন্নত শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিসর্জন দিয়ে নম নরগোষ্ঠীর উপসত্ত্বভোগীরা মতাদর্শচ্যুত হয়ে গিয়েছিলেন। ইন্দ্রের বজ্রতুল্য অকপট নম সখাটিসহ যদু, তুর্বা, অনু, পুরুরা তো সেই উপসত্ত্বভোগীদেরই প্রতিনিধি।

আর একটি উল্লেখ্যযোগ্য বিষয় হল এই যে, ঋগ্বেদে নমনরগোষ্ঠীর বস্তুবাদী লোকায়তিক মতাদর্শেরও পরিচয় আছে। তাই ঋষিরা তাঁদের রাক্ষস, দানব, মায়াবী, দস্যু প্রভৃতি নামে উল্লেখ করে যথাক্রমে যজ্ঞবিরোধী (1.29.13, 1.33.4-5.2.12-10, 7.6.3, 8.70.11 ইত্যাদি ঋকে), ব্রাহ্মণবিরোধী (2.22.4, 4.16.9 ইত্যাদি ঋকে) এবং দেবতাবিরোধী (5.42.9, 8.70.11, 10.38.3, 10.182.3 প্রভৃতি থেকে) এবং অমন্তু। অর্থাৎ যাঁরা প্রমাণ বা ' যুক্তিব্যতীত কোন কিছুকে মেনে নেন না (10.22.8) বলে চিহ্নিত করেছেন। এর দ্বারা নম নরগোষ্ঠীর মানুষদের বীর্যবত্তা, ব্যক্তিত্ব, সম্পদ সৃষ্টি এবং তার সদ্ব্যবহারের পারদর্শিতা এবং কার্যকারণের সম্বন্ধনির্ণয়ে ব্যাপৃতবস্তুবাদী লোকায়তিক মতাদর্শপুষ্ট উন্নত চেতনার পরিচয়ও পাওয়া যাচ্ছে।

বঙ্গের সম্পদশালী নগরসভ্যতার স্রষ্টা নম নরগোষ্ঠীর পরিচয়ও ঋগ্বেদে আছে।

" তং করঞ্জমুত পর্ণয়ং বধীস্তেজিষ্ঠযাযাতিথিপবস্য বর্তনী।

ত্বং শতা বঙ্গৃদস্যাভিনৎপুরোঅনুনাদঃ পরিষূতা ঋজিশ্বনা ॥ [ঋগ্বেদে সংহিতা :1.53.8]

হে ইন্দ্র! অতিথি পব নামক বরেণ্য ব্যক্তির জন্য করঞ্জ ও পর্ণয় নামক শত্রুদ্বয়কে তেজস্বী বর্তনী দ্বারা তুমি বধ করেছ, তারপর ঋজিশ্বনের দ্বারা অবরুদ্ধ বঙ্গের দস্যু অধিপতির শত শত দুর্গ তুমি একাকী ধ্বংস করেছ।

ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রীদের অগম্য প্রাচীন বঙ্গের ঐশ্বর্যবান অধিপতি এবং অধিবাসীদের সম্পর্কে এই ঋকের বাস্তব সত্য এইটুকু যে তাঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ্য অভিধায় দস্যু অর্থাৎ নম নরগোষ্ঠীর মানুষ ছিলেন উৎকৃষ্ট সম্পদরাশির স্রষ্টা। উন্নত নগরসভ্যতার আর নাগরিক সংস্কৃতির অধিকারী।

বঙ্গ, গঙ্গা প্রভৃতি মুণ্ডাভাষার নামপদ। [P.C. Bagchi, *Pre Aryan and Pre Dravivdian*, P-72 ff. cf Romila Thapar, *Cultural Pasts*, P-331(Ref. No. 33] 'বোঙ্গা' (অর্থাৎ মুন্ডাভাষার 'উঁচু জাতি') শব্দ থেকে 'বঙ্গ শব্দটি এসেছে। ছোটনাগপুর সন্নিহিত পুরাভূমির প্রাচীন নাম 'বঙ্গ' ছিল একান্তই সার্থক। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম মেদিনীপুরের তপোবনে একটি প্রস্তর নির্মিত দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার ও পাণ্ডুরাজার ঢিবি, ভেদিয়া, মঙ্গলকোট প্রভৃতি স্থানের খননে প্রাপ্ত ঋগ্বেদের কালের বা তারও আগেকার প্রত্নসামগ্রী সন্দেহাতীতভাবে প্রাচীন বঙ্গকে নমনরগোষ্ঠীর একাংশের সভ্যতা আর সংস্কৃতির পীঠস্থানরূপে তুলে ধরেছে। পরে অবশ্য তাঁরা সমস্ত নিম্নগাঙ্গেয় সমতলে ছড়িয়ে পড়েছিলেন।

অতঃপর জানা গেল যে, খ্রিস্টপূর্ব 1500 অব্দের কিছু পূর্বের অথবা পরের কোন সময় থেকে শুরু করে খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত বিস্তৃত তিন হাজার বছরের অধিকাল পেরিয়ে এসে নিজস্ব মতাদর্শপুষ্ট বৃহৎ এই নমনরগোষ্ঠীর মানুষেরা ভারতের সকল অঞ্চল থেকে অদৃশ্য হয়ে শুধু তৎকালের পূর্বাঞ্চলের বাংলা নামের একটি বড় মাপের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে বিপুল

সংখ্যায় কেন্দ্রীভূত হয়েছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে আরও জানা গেল যে, ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে এবং সরকারী নথিতে তারা, 'অস্পৃশ্য উপনরের' আখ্যাপ্রাপ্ত ' চণ্ডাল' নামে চিহ্নিত হয়েছেন, যদিও তাঁরা মনু নির্ধারিত কোনরূপ চণ্ডাল বৃত্তিতে নিজেদের আবদ্ধ করেন নি। চরিত্রগত ভাবে মাত্রাতিরিক্ত স্বাধীনচেতা ও সম্পূর্ণ স্বনির্ভর [(" ... characterised by unusual amount of independence and self reliance ... ") - H.H. Risley, The Tribes and Castys of Bengal I, P-184.] সর্বকর্মে পারদর্শী জাতি হিসাবে পরিগণিত [(" Chandals actually work at anything. They are ..... employed in the boats (bajra) hired by Europeans. They form a large proportion of the peasantry; and they are shopkeepers, goldsmiths, blacksmiths, carpenters, oilmen, as well as successful traders.") - H.H. Risley, The Tribes and Castes of Bengal I, P-188] এবং তাঁরা ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রীয় অপপ্রচারের সত্যতা সর্বদাই অস্বীকার করে চলেন।

তা হলে কি ব্রাহ্মণেরা ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে তাঁদের বিতাড়িত করেছিলেন? 'আর্য আগ্রাসনের তত্ত্বের আলোকে সেটিই একমাত্র সম্ভাব্য উত্তর ছিল। ঐ তত্ত্বটি ঐতিহ্যসিকেরা এখন পুরোপুরি বাতিল করে দিয়েছেন বলে ঐ সিদ্ধান্তটিকেও আর মানা যায় না। তাছাড়া এখন নিশ্চিতরূপে জানা গেছে যে, পুষ্যমিত্র শুঙ্গের রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের পূর্বে ব্রাহ্মণেরা নিজেরাই পায়ের তলায় শক্ত মাটি খুঁজে পান নি। এমতাবস্থায় এটাই বাস্তবসম্মত বলে মনে হয় যে, খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শুরুতেই সারা ভারতের নানা অঞ্চল থেকে সমৃদ্ধির সন্ধানে নম নরগোষ্ঠীর এক বৃহদংশের মানুষ নিম্নগাঙ্গেয় সমতলের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিলেন। তাঁদের ঐতিহ্যগত লোকায়ত বস্তুবাদী মতাদর্শের অনুপ্রেরণায় দলগত শ্রমে সেখানকার অগম্য প্রকৃতিকে জয় করে অগ্রগামী সভ্যতা গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞায় ও নিজেদের নরগোষ্ঠীর নামের সাযুজ্যে 'নম' বা 'নমো' জাতি নামগ্রহণ করেছিলেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তাঁরা সর্বার্থে সার্থক জাতিতে (People) পরিণত হয়েছিলেন এবং তাঁদেরই নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল সমন্বিত রাষ্ট্রপুঞ্জরূপে প্রথমে প্রাচ্য এবং পরে সহঙ্গ। জনকল্যাণকর

রাষ্ট্রপুঞ্জরূপে সম্বন্ধ সারা পৃথিবীর আদর্শ হয়ে উঠেছিল এবং তা ' মহাস্থানগড় লিপি'র ভাষ্যেই ফুটে রয়েছে। [R.K. Mukherjee & S.K. Maity, The Corpus of Bengal Incriptions, pp :39-40] - এই সম্বঙ্গই বিদেশীদের কাছে সম্ভবত গঙ্গারিডি নামে সুখ্যাত হয়েছিল । গৌড়, পুণ্ড্র, বঙ্গ এবং সুহ্মের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল সেই জনকল্যাণকর সম্বঙ্গ এবং লোকায়তিক বস্তুবাদী মতাদর্শ ছিল তার প্রাণশক্তি। এই প্রাণশক্তির প্রভাবেই উত্তর ভারতের ভাববাদের প্লাবন খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত সম্বঙ্গের সীমানাই স্পর্শ করতে পারেনি। অবশেষে 439 খ্রিষ্টাব্দে কুমার গুপ্তের আক্রমণে গৌড় ও পুণ্ড্রের সাময়িক পরাজয়, শশাঙ্কের স্বল্পস্থায়ী আধিপত্য এবং পরবর্তী অরাজক পর্ব ভাববাদী বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণদের বাংলার মাটিতে অনুপ্রবেশের কিঞ্চিৎ সুযোগ এনে দিয়েছিল , তবে অষ্টম শতাব্দীতে পাল রাজবংশ প্রতিষ্ঠার পূর্বে তাঁদের সামাজিক শক্তিতে আত্মপ্রকাশের সুযোগ ঘটেনি [Sekhar Bandyopadhyay, Caste, Politics and the Raj, p 8]

পাল আমলে সদ্য বৌদ্ধ হওয়া ভাববাদে আবিষ্ট উপসম্ভভোগী জাতিদ্রোহীরা জন্মস্মৃতির জ্বালা ভুলতে আদি বাংলা বহু কবিতা চর্যাপদ রচনা করে মনুর দ্বারা বিশেষণযুক্ত ' চণ্ডাল' শব্দে প্রথম নমোজাতিকে বিদ্ধ করতে উদ্যোগী হন এবং ব্রাহ্মণ্য ঘরানার পুরুষানুক্রমিক বৌদ্ধরা সংস্কৃত ভাষায় সেই নিন্দার মাত্রা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেন। সারবত্তাহীনতার জন্য এসব অপপ্রচারের জোয়ারে অবশ্য অচিরেই ভাটা পড়েছিল । অতঃপর সেন-বর্মন আমলের রাজনৈতিক পালাবদলের সময়ে গোণাগুণতি কয়েকজন বৌদ্ধ শ্রমণ তিব্বতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বাকি সকলেই ব্রাহ্মণ্য পাতি সংগ্রহ করে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের এক একটি জাতিবর্ণে পরিণত হয়েছিলেন [Sekhar Bandyopadhyay, Caste, Politics and the Raj, p 8]। তাই তো বাংলার জাতিবর্ণের মানুষেরা নিজেদের বিজ্ঞানসম্মত নৃতাত্ত্বিক পরিচয় না দিয়ে দ্বাদশ শতাব্দী বা তার পরবর্তী কালের ব্রাহ্মণ্যজাতিগত পরিচয়ে এখনও আবদ্ধ হয়ে আছেন। পাল এবং সেন-বর্মন আমলে চণ্ডাল গালিটি নমোজাতির বুকের উপর জগদ্দল পাথর হয়ে চেপে বসেছিল। তা সত্ত্বেও তেজস্বী জাতি ক্ষেত্র বিশেষে হিংসা-বিদ্বেষ উপেক্ষা করে, ক্ষেত্র বিশেষে

প্রতিরোধ করে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে দল বেঁধে দুর্গম জঙ্গল অঞ্চলে চলে গিয়ে এক বড় অংশের বাঙালিজাতিকে নমোজাতি নামে ধরে রাখতে পেরেছিলেন। ড. লীনি শ্রীনিবাসন কর্তৃক রচিত 'মিশর থেকে আসা বাংলা শব্দ' গ্রন্থে যে তালিকাটি দেওয়া আছে সে সব শব্দ নমোজাতির দৈনন্দিন জীবনে আজও বহুল ব্যবহৃত। আফ্রিকা মহাদেশে 'নমোল্যাণ্ড' বলে একটা সুবিপুল অঞ্চলও বর্তমান। এ থেকে এমন সিদ্ধান্ত করাই যায় হিন্দুকরণে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি হিন্দু জাতের জন্ম (নীহার রঞ্জন রায়ের 'বাঙালির ইতিহাস' দ্রষ্টব্য) - এসেছিলেন সুদূর আফ্রিকা মহাদেশের মিশর থেকে।

মুসলিম আমলের প্রথম দিকে রাজশক্তির দ্বারা প্ররোচিত হয়ে ব্রাহ্মণেরা নমোঘৃণার মাত্রা তুঙ্গে তুলে দিয়েছিলেন এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রীরা সেই উচ্চগ্রামের নিন্দাবাদকে সমস্বরে প্রচার করে নির্যাতনে নমোদের অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন আর রাজশক্তি তাঁদের প্রতি ইসলামের আপাত সাম্য মৈত্রী সৌভ্রাত্রের আহ্বান জানাচ্ছিলেন। রাজশক্তির উদ্দেশ্য - পুণ্যার্জন, অক্ষয় স্বর্গ বাস এবং বিপুল শ্রমশক্তির অনায়াস পৃষ্ঠপোষকতা। আর ব্রাহ্মণদের এবং তাঁদের সেবাদাসদের উদ্দেশ্য - তাঁদের জাতিবর্ণের উৎপত্তির 'নিন্দিত' উৎসটির নিঃশেষ। হ্যাঁ, সমগ্র নমোজাতির আপন সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের বির্সজনজনিত ইসলামায়নেই তা সম্ভবপর ছিল। ঘটনা সত্য যে, নমোজাতির একাংশের মানুষ মুসলমান হয়েছিলেন; কিন্তু আরও গভীরতর সত্য হল এই যে, লোকায়তিক বস্তুবাদী নমোজাতি বাস্তবানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করে নিজের অস্তিত্বকে রক্ষাও করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে, শুধু মুসলিম রাজত্বের সূচনা পর্বে নয়, তার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী কালের অজস্রবারের অস্তিত্বের কুটিল সঙ্কটের ঘনঘটা প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে অতিক্রম করে আসা নমোজাতির মানুষেরা আজও নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছেন এবং তাঁরা ভারতের এবং বিশ্বের শোষিত নিপীড়িত মানুষদের মুক্তির সংগ্রামে অগ্রণীভূমিকা পালন করার স্বপ্নও দেখেন। কেননা এই স্বপ্ন তাদের বস্তুবাদী জীবন-দর্শনের ফলশ্রুতি।

আধুনিক ভারতে বৌদ্ধধর্ম

টি বিজয়েন্দ্র
বাংলা ভাষান্তর - প্রতুল মুখোপাধ্যায়

তর্জনীর নির্দেশ বাইরের দিকে - আম্বেদকরের প্রতিমূর্তি এমন করে কেন গড়েন ভাস্কররা? কারণ তিনিই তো আবার চালু করলেন বৌদ্ধ ধর্মচক্র (যা ভারতে বন্ধই ছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী) - রীতিমত চাকার পাখিতে (spokes) আঙুল দিয়ে। এমনই শোনা যায় ... আধুনিক ভারতে বৌদ্ধধর্মের পুনরুত্থানের কাহিনী, যেমন মন-কাড়া তেমনই রোমান্টিক।

এ গল্পের শুরু গোয়ার কোঙ্কনে ক্ষেতে কাজ করা একটি ছেলেকে দিয়ে। নেহাতই ঘটনাচক্রে এক মারাঠি খবরের কাগজের ছেঁড়া পাতায় তার চোখে পড়ল বুদ্ধের জীবনকাহিনী। সেই কাহিনী তাকে এমনই আবিষ্ট করল যে বৌদ্ধধর্মের সন্ধানে সে চলে যায় বুদ্ধের জন্মভূমি নেপাল - পুনে আর বেনারস (বারাণসী) হয়ে, সেখানে সংস্কৃত আর পালি চর্চা করে। নেপাল গিয়েই সে বুঝতে পারে বৌদ্ধধর্মের খোঁজ নিতে হলে তাকে যেতে হবে সিংহল (এখন শ্রীলঙ্কা)। অদম্য উৎসাহে সিংহল আর বার্মা (এখন মায়ানমার-অনুবাদক) পরিভ্রমণ করে সে হল বৌদ্ধ এবং এক বিদ্বান পন্ডিত। ভারতে ফিরে এসে তিনি (আর সে নয়, তিনি বলাই ঠিক - অনুবাদক) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি পড়ালেন, তারপর চলে যান বরোদা, সেখানে দেখা হল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জেমস উড-এর সঙ্গে , শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের বিষয়ে এক ইয়া মোটা বই সম্পাদনা ও অনুবাদ করে ছাড়েন, যা প্রকাশিত হয় হার্ভার্ড গ্রন্থমালার (Harvard Oriental Series) একটি খন্ড হিসেবে। আবার ভারতে ফিরে আসা, গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা, লবণ সত্যাগ্রহে যোগদান, তারপর ছ'বছর জেলে কাটিয়ে চলে এলেন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে। শেষ দিকে

তিনি তাঁর জৈন ধর্মমত অনুসারী জীবন থেকে প্রস্থানের সিদ্ধান্ত নিলেন। তখনই গান্ধির অনুরোধে সেবাগ্রামে এসে বাস করতে থাকেন, সেখানেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাস। আচার্য ধর্মানন্দ কোসাম্বি (১৮৭৬-১৯৪৭) এখনও ভারতে বৌদ্ধধর্ম ও জৈন ধর্মের বিষয়ে শ্রেষ্ঠ পন্ডিতদের একজন। তিনি এক কীর্তিমান পুত্রের পিতাও বটে - তাঁর ছেলে হচ্ছেন দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বি।

শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধধর্ম

কী দেখলেন কোসাম্বি শ্রীলঙ্কায়? বৌদ্ধধর্মের এমন বাড়বাড়ন্ত সেখানে কী করে হল? সে আর এক রমন্যাস(romance)। ১৮৮০ র ১৮ই মে দু'জন বর্ণময় ব্যক্তিত্বের শ্রীলঙ্কায় প্রবেশ - একজন নিউ ইংল্যান্ডের পিউরিটান (ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে যে দল ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ক্যাথলিকদের মত আড়ম্বর বর্জন করার দাবি জানায়, সেই দলের অনুগামী) কর্নেল হেন্‌রি স্টিল অলকট (Col.Henry Steele Olcott ১৮৩২-১৯০৭) আর একজন গুপ্ত বিদ্যাবিশারদ (occultist) ম্যাডাম হেলেনা পেত্রভ্‌না ব্লাভাৎস্কি (Mme Helena Petrovna Blavatsky ১৮৩১-১৮৯১)। তাঁরা নিজেদের বৌদ্ধ বলে পরিচয় দিলেন বটে, কিন্তু সেখানে তাঁদের দেখা বৌদ্ধ সম্প্রদয়ের করুণ অবস্থার শরিক হলেন না। তাঁরা সৃষ্টি করলেন বৌদ্ধধর্মের ' এক' স্বল্পজনবোধ্য গোষ্ঠীগত প্রকারান্তর, সারবস্তুতে যা বেদান্তের মতই। এর আগেই ১৮৭৫-এ তাঁরা নিউইয়র্কে থিয়সফিকাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সত্যিই এক মাসের মধ্যে ১৮৮০ র ১৭ই জুন তাঁরাই সৃষ্টি করলেন বুডটিষ্ট থিয়সফিকাল সোসাইটি।

ওলকট ছিলেন এক পরম উৎসাহী শিক্ষাব্রতী। এর মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিশিক্ষার সূচনা করেছেন তিনি। এখানে এসে তিনি প্রচার চালালেন বৌদ্ধ শিশুদের ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য, আগে এই বিশেষ সুবিধা ভোগ করতেন কেবল খ্রিষ্টানেরাই। ১৮৮১ তে তিনি লিখলেন বৌদ্ধ প্রশ্নোত্তরমালা (Buddhist Catechi) , স্থাপিত করলেন বুডটিষ্ট এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন। তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হল কলম্বোতে আনন্দ কলেজ (১৮৮৬), কান্ডিতে

ধর্মরাজ কলেজ (১৮৮৭) এবং গালে (Gulle) তে মহীন্দ্রব কলেজ (১৮১২)। ১৮৮৯ সালে জাপান গেলেন তিনি, বৌদ্ধধর্মীয় ১২ টি গোষ্ঠীকে একত্রিত করলেন এবং বার্মা, শ্যাম (এখন তাইল্যান্ড-অনুবাদক) ও সিংহলের দক্ষিণী বৌদ্ধদের একটি সম্মেলনের আয়োজন করলেন।

এই বৌদ্ধধর্মেরই বাড়বাড়ন্ত দেখেছিলেন যুবক কোসাম্বি শ্রীলঙ্কায়। আধুনিক সিংহলের বুর্জোয়া/ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেশির ভাগই ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষার ফসল। অলকটের প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হলেন এক সিংহলী যুবা। তাঁর বাবা আসবাবের ব্যবসা করেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের অকৃত্রিম সারল্য গভীর ছাপ রেখে যায় যুবকের মনে। অলকট তাঁকে ১৮৮৪ সালে আডিয়ায় নিয়ে যান, আবার ১৮৮৬ সালে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন বুডটিস্ট এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশনের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে। এই যুবক ভিক্ষু (Bhikku) অনাগরিক ধর্মপাল গ্রামের মানুষদের দুর্দশা দেখে স্থির থাকতে পারতেন না। তিনিই হয়েছিলেন সেই মহান বৌদ্ধ পণ্ডিত ও প্রচারক যিনি বৌদ্ধধর্মকে ভারতে নিয়ে আসেন। বিপুল ব্যক্তিগত ক্ষতি স্বীকার করে তিনিই নিলেন পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের প্রবর্তকের ভূমিকা।

বৌদ্ধধর্ম ফিরে আসে ভারতে

১৮৯১ সালে অনাগরিক ধর্মপাল মহাবোধি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। তার আগে ভারতে বৌদ্ধধর্ম ছিল চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে। বুদ্ধের জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পবিত্র স্থানগুলি পড়ে ছিল অবহেলায়, ভগ্নদশায়। সমাধিমন্দির বা স্মৃতিসৌধগুলি, যেগুলি দ্রষ্টব্য বস্তু হিসেবে বিবেচিত হত। বোধগয়া মন্দিরের শোচনীয় অবস্থা দেখে ধর্মপালের দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হল। তিনি সংকল্প করলেন বোধগয়া মন্দির এবং বৌদ্ধধর্মসংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্থানগুলি পুনরুদ্ধার করবেন এবং এই ধর্মের জন্মভূমিতেই ধর্মের প্রসার ঘটাবেন। এই উদ্দেশ্যেই মহাবোধি সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি।

ধর্মপালের উদ্যোগে যার সূচনা সেই বৌদ্ধ পুনরুজ্জীবন আন্দোলন ভারতের বহু অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। সোসাইটির শাখা স্থাপিত হল বোধগয়া, কলকাতা, মাদ্রাজ (এখন চেন্নাই-অনুবাদক) ও সাঁচিতে। তাঁর প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে রাহুল সংকৃত্যায়ন, ভাদন্ত (Bhadant)আনন্দ কৌশল্যায়ন, জগদীশ কাশ্যপ ও ধর্মরক্ষিত এর মতো অনেক বিদগ্ধজনের মধ্যে। তাঁরা প্রশিক্ষণ দিতেন শ্রীলঙ্কায়, আর ভারতের থেকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হারিয়ে যাওয়া বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ করে ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রচার করতেন।

ভারতে ও শ্রীলঙ্কায় জনসাধারণের জন্য ধর্মপাল প্রতিষ্ঠা করেছেন উপাসনা কেন্দ্র, গ্রন্থাগার, স্কুল, কলেজ, অনাথ আশ্রম ও হাসপাতাল। তিনি ছিলেন এক মহান দেশপ্রেমিক এবং ভারত ও শ্রীলঙ্কা - এই দুই দেশেরই স্বাধীনতার অদম্য প্রবক্তা। তিনি ভারতকে সাহায্য করেছেন বুদ্ধকে নতুন করে আবিষ্কার করতে, শিখিয়েছেন বৌদ্ধধর্মের ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির জন্য গর্ব অনুভব করতে। বোধগয়া, সারনাথ, কুশীনগর, সাঁচি ও আরও অনেক বৌদ্ধধর্মসংশ্লিষ্ট পবিত্র স্থানের এখনকার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির অবস্থা হল ধর্মপালের ক্লান্তিহীন ও নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার প্রত্যক্ষ ফল।

১৯৩৩ এর ২৯ এপ্রিল সারনাথে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর শেষ কথা ছিল - ' 'আমাকে শীঘ্র মরতে দাও। আমাকে আবার জন্ম নিতে দাও। আমি আর যন্ত্রণাকে দীর্ঘায়িত করতে পারছি না। বৌদ্ধধর্মের (Buddha Dharmma) প্রসারের জন্য আমি পঁচিশবার পুনর্জন্ম চাই।'

ভীমরাও রামজী আম্বেদকর (১৮৯১-১৯৫৬)

১৯৩৩ সালের দলিত শ্রেণী সম্মেলনে (Depressed Classes Conference) আম্বেদকর 'হিন্দু' ভারতকে একটা প্রচন্ড ধাক্কা দিলেন এই ঘোষণা করে যে তিনি হিন্দু হয়ে জন্মেছেন বটে, তবে হিন্দু থেকে মরতে চান না। সেই সময় থেকেই ধর্মান্তরণের বিষয়টি একাগ্রভাবে বিচারবিবেচনা করেছিলেন।

এর পরেও বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতেকরতে তাঁর এই বিশ্বাসই দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হল, যে হিন্দু ধর্মের মধ্যে অস্পৃশ্যদের কোন ভবিষ্যৎ নেই, তাদের অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করতে হবে এবং তাদেরপক্ষে গ্রহণের উপযোগী শ্রেষ্ঠ ধর্ম হল বৌদ্ধ ধর্ম। কোন কোন পন্ডিত মনে করেন, মার্কিন দার্শনিক এবং তাঁর শিক্ষক জন ডিউই(John Dewey) তাঁকে প্রভাবিত করেছিলেন।

১৯৫০ সালে ইয়ং মেনস বুডটিস্ট অসোসিয়েশন, (অনুবাদে যুবা বৌদ্ধ সমিতি) কলম্বোর আমন্ত্রণে তিনি শ্রীলঙ্কা গিয়ে কান্ডিতে ওয়ার্ল্ড ফেলোশিপ অব বুডটিস্টস (অনুবাদে বিশ্ব বৌদ্ধ মৈত্রী) - এর এক সভায় ভাষণের সময় শ্রীলঙ্কার অস্পৃশ্যদের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের অুরোধ করেন। প্রাচীন ভারতে নারীর সামাজিক মর্যাদার অবনতির জন্য বুদ্ধ দায়ী এই অভিযোগের বিরোধিতা করে ১৯৫১ সলে তিনি একটি প্রবন্ধ লেখেন সেই বছর সঙ্কলন করেন বৌদ্ধ উপাসনা পাঠ নামে বৌদ্ধ ভক্তিভাবাশ্রিতস্তুলরচনার একটি সংগ্রহ।

১৯৫৫ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ভারতীয় বৌদ্ধ মহাসভা বা বুডটিস্ট সোসাইটি অব ইন্ডিয়া। এই উপলক্ষে সমাতে হাজার হাজার অস্পৃশ্য মানুষের সামনে তিনি ঘোষণা করেন - তিনি এর পরথকে ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। তিনি একথা জানান যে তিনি 'বুদ্ধ ও তাঁর ধর্ম' নামে একটি বই লিখছেন, যেখানে বৌদ্ধধরে নীতি ও মতবাদের ব্যাখা থাকবে সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য সহজবোধভাষায়। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পর, ১৯৫৭ সালের নভেম্বর মস। অনেকেই বইটিকে এক মহান সৃষ্টি বলে বর্ণনা করেন। ১৯৫৬ সালের ১৪ অক্টোবর, আম্বেদকর এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর থেকে ঐতিহ্যবাহী রীতিতে ত্রি শণ (Three Refuges) ও পঞ্চ শীল (Five Precepts) গ্রহণ করেন এবং তরপরই ক্রমে ক্রমে তাঁর আহ্বানে নাগপুরে আগত ৩,৮০,০০০ নরনারী ও শিকে তা পাঠ করান। আম্বেদকরের মৃত্যু হয় ১৯৫৬ সালের ৬ ডিসেম্বর।

আম্বেদকর বৌদ্ধ ছিলেন মাত্র সাত সপ্তাহ, কিন্তু ওই সময়ে তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসারের জন্য যা করেছেন, অশোকের পরে আর কোন ভারতীয় সম্ভবত ততটা করতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর সময় সাড়ে সাত লক্ষ অস্পৃশ্যদের বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করা হয়ে গিয়েছিল, এবং তার পরের কয়েক মাস শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে মানুষ একই পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তাঁদের নেতার আকস্মিক মৃত্যুজনিত অনিশ্চয়তা আর বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও।

বৌদ্ধধর্মের পুনরুজ্জীবন দলিতদের সহায়তায় ব্যর্থ হল কেন?

বিশ শতকের ভারতের নিঃসন্দেহে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ছিল দলিতদের জন্য আম্বেদকরের অবদান। তাঁর বৌদ্ধ ধর্মান্তরণ ভারতকে দিয়েছিল কাঁচানি আর দলিতদের দিয়েছিল গর্ববোধ। বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা উদারপন্থী এবং যাঁরা অস্পৃশ্যতার রীতি এবং দলিতদের উপর নিগীড়নে অস্বস্তি / লজ্জা অনুভব করতেন, তাঁরাও জোর পেলেন এই কাজে। সমাজতন্ত্রী (Socialist) ও সাম্যবাদী (Communist) অভিমুখের ধারাগুলিও শক্তিশালী হল এর ফলে। এটাও মনে রাখা উচিত, ভারতের সংবিধানের খসড়ায় স্বীকৃতিবাচক ন্যায়বিচার (সংরক্ষণ) অনুচ্ছেদসমূহ [affirmative justice (reservation) clauses] যুক্ত করার কাজে আম্বেদকর একটি বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

দলিতদের সংগ্রামে আম্বেদকর এখনও একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ নাম, তবে সেখানে বৌদ্ধধর্মের কোন লক্ষণীয় ভূমিকা ছিল না, অন্তত সে ধরনের পাড়া গাঁয়ের নব্যবৌদ্ধদের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিতে বাস্তবে কোন পরিবর্তন হয়নি। তাঁদের গ্রাম্য বৌদ্ধধর্মের ঝোঁক হল বুদ্ধ আর আম্বেদকরকে দিয়ে নতুন দেবতা বানিয়ে তাদের নানান হিন্দু দেবদেবীর মন্দিরে মানানসই করে বসিয়ে দেওয়ার। এমন কি শুচি-অশুচি, হ্যানো দোষ ত্যানো দোষ এমন ধারণা, যার নজর তাঁদের নিজেদের চেয়েও 'নীচু' জাতের দিকে বহাল তবিয়তে ছড়িয়ে রইল অনেক

জায়গা জুড়ে। দোষটা কিন্তু পুরোপুরি তাঁদের নয়। দরিদ্র দলিত অঞ্চলে বৌদ্ধ বিহারগুলি ছিল উপেক্ষিত। পুরোহিত বা বৌদ্ধ ভিক্ষুরা কখনও যান না সেখানে। দলিতেরা বারবার দাবি করেন - তাঁদের অন্তত কয়েকটা বৌদ্ধ প্রার্থনামন্ত্র শেখানো হোক। কিন্তু কারও দেখা নেই। নব্যবৌদ্ধদের মধ্যে তুলনায় বেশি শিক্ষিত, রাজনীতি সচেতন, শুধু এমন এক সংখ্যালঘু অংশই বৌদ্ধ শিক্ষার বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিটি (temper) জীবনে গ্রহণ করেছেন। আরও সহজ ভাষায়, এর অর্থ হল, এটি তাঁদের মধ্যশ্রেণীর মর্যাদা অর্জনে সহায়তা করেছে।

উনিশ শতকের হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ

শ্রীলঙ্কায় ও পরে ভারতে বৌদ্ধধর্মের পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে উনিশ শতকের ও বিশ শতকের প্রথম দিকের হিন্দু পুনরুজ্জীবনের সাদৃশ্য চোখে পড়বার মতো। শ্রীলঙ্কায় যেমন, এখানেও তাঁরা, মানে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরা খ্রিষ্টানদের সমালোচনার আর খ্রিষ্টানদের থেকে বিপদের আশঙ্কার সম্মুখীন হলেন। দুটি বিপরীতমুখী টানের সামনে পড়ল তাঁরা। একদিকে তাঁরা চাইছিলেন ঔপনিবেশিক চাকরি বা কাজকর্ম আর ঔপনিবেশিক প্রভুদের সঙ্গে সামাজিক মেলামেশা, অন্যদিকে তাঁরা চাইছিলেন না তাঁদের দেশেরই আরও 'সাহসী' কিছু লোকের মতো খ্রিষ্টান হতে। সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তা পাওয়া গেল হিন্দু ' সংস্কারে', ব্রাহ্ম সমাজ ও আর্য সমাজের চেহারায়। নিঃসন্দেহে এ সব 'সংস্কার' ঔপনিবেশিকবিরোধী সংগ্রামেও মদত দিয়েছিল। সারা দেশ জুড়ে এরকম নানা 'সংস্কারের ' উদ্ভব ঘটল - এদের বেশির ভাগেরই লক্ষ্য ছিল শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী, যদিও বলা হত সারা দেশের নামেই। যা সত্য ও গুরুত্বপূর্ণ তা হল - এ সবই ফিরে গেল প্রাচীন ভারতের দিকে, ফিরে গেল বেদের আধিপত্যের দিকে, উপেক্ষা করল মধ্যযুগের সাধু সন্তদের, আর রয়ে গেল কর্তৃত্ববাদী আর গোষ্ঠীতান্ত্রিক। এ সবই আভাসে ইঙ্গিতে বোঝাতে চেয়েছে

মুসলিম আক্রমণই হিন্দুসমাজের দুরবস্থার জন্য দায়ী। এর ফলে, এমন কি উনিশ শতকেও দেখা গেল হিন্দু-মুসলিম বিভাজন উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশ জুড়ে।

গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ (মূল রচনায় Tagore- অনুবাদক) দুজনেই এই সমস্যার বিষয়ে সজাগ ছিলেন। গান্ধী নিজেকে সনাতন হিন্দু বলতেন বটে, তবে তাঁর উপর টলস্টয় এবং স্বৈরতন্ত্রবিরোধী ক্রিশ্চিয়ান কোয়েকার্স-এর প্রভাব ছিল। হিন্দুধর্মের মধ্যে তিনি এমন ঐতিহ্যের নিদর্শন খুঁজতে থাকেন এবং পেয়েও যান এবং সফল প্রয়োগ করেন দক্ষিণ আফ্রিকায় ও পরে ভারতে। এজন্যেই তিনি পেরেছিলেন ভারতীয় সমাজের একটি ব্যাপক অংশের মানুষের সঙ্গে কাজ করতে, তাদের অনুপ্রাণিত করতে।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন, তাঁর সময়ে ভারতে মধ্যযুগীয় বিভিন্ন ধর্মীয় আন্দোলন বিষয়ে তিনিই সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর মহৎ কীর্তি 'মধ্যযুগের সাধনা' গ্রন্থটি প্রভাবিত করেছিল রবীন্দ্রনাথকে। বাংলার মাঝিমাল্লার গান থেকে শুরু করে পাঞ্জাবী টপ্পা পর্যন্ত বিপুল বিস্তৃত ভারতীয় লোকগানের শিক্ষা নিলেন রবীন্দ্রনাথ], এই লোকগানের বেশির ভাগেরই উৎস ভারতীয় সমাজের বিদ্রোহী, কর্তৃত্ববাদবিরোধী ঐতিহ্য। যে ব্যাপারটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়, তা হল এর মধ্যে গোষ্ঠীতান্ত্রিকতা তুলনায় কম আর এই গান হিন্দু-মুসলমন বিভাজনের রাস্তায় হাঁটেনি।

যাই হোক, যেহেতু নেতৃত্ব ছিল প্রধানত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, আন্দোলনও ছিল সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে পুনরুজ্জীবনবাদী কর্তৃত্ববাদী ও গোষ্ঠীতান্ত্রিক। যখন দিগন্তে স্বাধীনতার ছটা ঝাপসা ঝাপসা দেখা যাচ্ছে, বিশেষ করে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের (যখন শুধু বিত্তশালী শ্রেণীরই ভোটাধিকার ছিল) পরে, তখন গোষ্ঠীতন্ত্রকে স্পষ্টরূপ দেওয়া হল বেশ জোরদারভাবেই, ব্রিটিশদের কাছ থেকে শাসনক্ষমতার উত্তরাধিকার নিয়ে চলল ঘোঁটের লড়াই - যার শোচনীয় ফল

এখন তো ভালভাবেই জানা আছে অর্থাৎ ভারত ভাগ।

তাঁর সম্প্রদায় ক্রমাগত হেরে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে - এই দেখতে দেখতে আম্বেদকর মরিয়া হয়ে খুঁজতে লাগলেন সম্প্রদায়ের পুনর্নবায়নের একটি সাংস্কৃতিক রাস্তা। নানারকম ব্যক্তিগত ও ঐতিহাসিক কারণে (যার কয়েকটি সংক্ষেপে উপরে বর্ণিত হয়েছে) তিনি বৌদ্ধধর্মকেই বেছে নিলেন। ধর্মান্তকরণের কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। এ বিষয়ে অবদান বলতে তিনি যা রেখে যেতে পেরেছেন তা হল তাঁর বই 'বুদ্ধ ও তাঁর ধর্ম'। দলিত আন্দোলনে এর স্থান এখনও নেই বললেই চলে। হিন্দু সংস্কার আন্দোলনের মতোই আম্বেদকর ফিরে গেছেন প্রাচীন ভারতে। নিজের সমাজের উদ্দেশে তাঁর ভাষণে ফুটে উঠত তীব্র তিরস্কার, 'অপমান আর অত্যাচার সহ্য করার অসীম ক্ষমতা তোমাদের ..... এই সহিষ্ণুতাই তোমাদের মধ্যে প্রতিবাদের আর বিদ্রোহের অনুভবকে খুন করেছে। তোমাদের মধ্য থেকে শৌর্যবীর্য উচ্চাশা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেছে। তোমরা সবাই হয়ে গেছ অসহায়, নিস্তেজ আর ফ্যাকাশে। সর্বত্রই এখন হার মেনে নেওয়ার আর নৈরাশ্যের বাতাবরণ.....' মধ্যযুগীয় সন্তদের বিষয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া — তাঁরা জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা করেননি। তাঁর নিজের মানুষজনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি পুরোপুরি উপেক্ষা আর অবজ্ঞার মনোভাব থাকলেও সে সম্বন্ধে তাঁর যে কোন ধারণা ছিল না, তা তো নয়। তাঁর বাবাই তো ছিলেন কবীর-এর অনুগামী। তাই তাঁর বৌদ্ধধর্ম, যা ইংল্যান্ডের পিউরিটানদের মতবাদ আর ডিউই-র চিন্তাধারার যুক্তিবাদ মিশিয়ে তৈরি, শুধুই দলিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে সুবিধাজনক হল, দলিত দরিদ্রদের কোন কাজেই লাগেনি। তা ছাড়া এ কথাও কিছুতেই ভুললে চলবেনা, বৌদ্ধধর্মও কিন্তু তখন কর্তৃত্ববাদী ধর্মে পরিণত।

ভারতে বৌদ্ধধর্মের কী হল?

শ্রমজীবী দরিদ্রের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ সপ্তম শতকে উত্তর ভারতে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ করে মহাযান গোষ্ঠীর বাড়বাড়ন্ত অবস্থার সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়েছেন। তারপর যে কী হল বৌদ্ধধর্মের, তার কোন পরিষ্কার ছবি পাওয়া যায় না। তাই বলে তা কোন চিহ্ন না রেখেই উধাও হয়ে গেছে, তাও তো হতে পারে না।

এখন বলা হয়ে থাকে যে বৌদ্ধধর্মের ভারত ছাড়ার জন্য দায়ী হলেন শঙ্করাচার্য, কুমারিল ও উদয়নদের মতো বৈদান্তিক ও মীমাংসক আচার্যেরা। যদিও এ মত ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে সত্য নয়। এর মানে এইরকমই দাঁড়ায় যে পণ্ডিতসমাজ বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাস হারিয়েছিলেন এবং সাধারণ মানুষের কখনই বৌদ্ধধর্মতত্ত্বে আগ্রহ ছিল না। বৌদ্ধধর্ম যখন পৃষ্ঠপোষকদের হারাল, তখন অনেক বৌদ্ধমঠ বদলে হয়ে গেল শৈবমঠ। আজও লক্ষ লক্ষ মানুষ সেখানে পুজো দেন। বৌদ্ধধর্ম নিজে থেকেই তন্ত্র, যাদুবিদ্যা ইত্যাদির দিকে ঘুরে গেল লোক টানবার জন্য। নবম ও দশম শতকে নেপালের তরাই অঞ্চলে শৈব ও বৌদ্ধ সাধনার মিশ্রণের ফলে উদ্ভব হল নাথপন্থী যোগীদের। নেপালে আজও বুদ্ধ ও শিব সমানভাবে সম্মানিত। নাথপন্থীদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গোরখনাথ। প্রচলিত কাহিনী অনুসারে তাঁর সঙ্গে এখনকার অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীশৈলম পাহাড়ে দক্ষিণের লিঙ্গায়ত পরম্পরার প্রতিষ্ঠাতা অল্লমপ্রভুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সারা দেশ জুড়ে বইছে তখন পরিবর্তনের হাওয়া।

সাধারণ মানুষের দিকে, সাধারণ মানুষের ভাষার দিকে ফিরবার জন্য অনবরত চাপ আসছিল বিভিন্ন ধর্মমতের উপর। অপভ্রংশ (প্রাক্ আধুনিক ভাষা) সাহিত্যে আমরা বৌদ্ধ গান ও দ্বিপদীর (couplet) দেখা পাই। এর পর একই রকম পরোক্ষ উপমা (metaphor) বারবার ফিরে এসেছে অনেক সন্তের রচনায়। এই গতিপথ চূড়ান্ত পরিণতি পেল কবীরের আর নির্গুণ পরম্পরার সঙ্গে।

কবীর, দাদু ও জয়সির মতো উত্তরসূরিরা বড় হয়েছিলেন ইসলামি সামাজিক পরিমণ্ডলে। সুফিরা ভারতের নানা অংশে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং তাদের চিন্তাধারার বিষয়গুলি এই সব সন্তের বেশির ভাগেরই ভালভাবেই জানা ছিল। এর পরে গুরু নানকের ভ্রমণকাহিনীতে বহুবার সুফিদের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রসঙ্গ এসেছে। শিখধর্মের এক বিশেষ সৃষ্টি গ্রন্থসাহেব - সেই সময় পর্যন্ত নির্গুণ ঐতিহ্যবাহী বিশিষ্ট সন্তদের গান ও কাব্যের সঙ্কলন। এই ঐতিহ্যে বেদের ও গীতার কর্তৃত্ব স্বীকার করা হয়নি। এই ঐতিহ্য অনুসারী সন্তদের বেশির ভাগই এসেছিলেন কারিগরের (artisan)জাতি (caste) থেকে ।

এ ছাড়া প্রধানত ব্রজ ভাষায় লেখা কৃষ্ণ কাব্যের ঐতিহ্যও ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ভারতে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক, ব্রজবুলিতে কৃষ্ণকাব্য লেখা হয়েছে কেরালায়! বাংলা আর ওড়িশাতেও ব্রজ ঐতিহ্য বেশ জোরালোভাবেই বিরাজ করত। একই রকম বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছিল রামভক্তির ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যগুলিতে বেদের ও গীতার কর্তৃত্ব স্বীকার করা হত এবং বেশ কয়েকজন সন্তই ছিলেন ব্রাহ্মণ - সুরদাস ও তুলসীদাসের মতো।

ভারতের ঐতিহ্যে মধ্যযুগের সন্তদের আন্দোলনকে পন্ডিতেরা অনেক সময় ভক্তি আন্দোলন নামে অভিহিত করেন। এই নামটি আন্দোলনের বিভিন্ন ধারার মধ্যে পার্থক্য না করেই একসঙ্গে দেখার প্রবণতা এনে দেয়। যারা বেদ ও গীতার কর্তৃত্ব স্বীকার করেছেন তাদের, অন্যদের অর্থাৎ 'বেদ বাহ্য' ঐতিহ্যের অনুসারীদের মধ্যে একটি পার্থক্যের বিভাজন সম্ভব। আমার মনে হয় পরেরটি, অর্থাৎ কর্তৃত্ব-বিরোধী পরম্পরাগুলিই ভারতে বৌদ্ধধর্মের ধারাটি বহন করে চলেছে।

সব কর্তৃত্ব-বিরোধী ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল ইহজাগতিক বিষয়বস্তুর ব্যবহার। সুফি ঐতিহ্যে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রেমের প্রয়োগ হত এই চিন্তাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে, যে ঈশ্বরের রাজ্যে সবাই সমান আর ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার জন্য মোল্লা বা পণ্ডিতদের মতো কোন দালাল

ধরার প্রয়োজন নেই। কবীর তো বারবার ব্রাহ্মণদের নিয়ে, মোল্লাদের নিয়ে আর সংস্কৃত নিয়ে ঠাট্টাতামাশা করেছেন। এই সন্তদের ব্যবহৃত উপমা সবসময়ই সাধারণ চাষি, কারিগর বা হস্তশিল্পীর রোজকার জীবন থেকে নেওয়া। এই দৃষ্টিভঙ্গিই ফুটে উঠেছে গালিবের মতো অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবিদের লেখায়। আমি মনে করি এই সব ঐতিহ্যই ইহজাগতিক বা লোকায়ত সাহিত্যের মতাদর্শের ও সংগঠনের গৌরবময় উত্তরসূরি।

আজ আমরা দেখতে পাই, গ্রামের ও শহরের, বিশেষ করে কারিগরের জাতি থেকে আসা শ্রমজীবী মানুষ এই সব ঐতিহ্য পেয়েছেন উত্তরাধিকারসূত্রে। বেশির ভাগ শ্রমজীবী বিভিন্ন ঐতিহ্যের মধ্যে প্রভেদ করেন না। সাধারণত তাঁরা সব ঐতিহ্যকেই সম্মান করেন (হিন্দু মন্দিরে যেমন নানা দেবদেবীর পূজা দেন, সেই ধরনেই!) কিন্তু অনেকেই অনড় থাকেন নির্গুণ ঐতিহ্যের মধ্যেই। কোন জেলায় যেখানে শ্রমিক শ্রেণীর বাস, একে একে শ্রমিকের দল জড়ো হয়ে এই (ঐতিহ্যের) গান করেন। সাপ্তাহিক বাজারের ফুটপাতের বইয়ের দোকানে অনেক সময় এই সব সন্তদের বিষয়ে ফেরিওয়ালার চটি বই বিক্রি হয়। এই ঐতিহ্যেই স্পষ্ট রূপ নেয় নানা উৎসবে আর সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সাংস্কৃতিক জীবনে। এই ঐতিহ্যেরই দেখা মেলে অনেক আধুনিক পাশ্চাত্যভাবাপন্ন সেইসব মানুষের স্ত্রী কিংবা মা-বাবার মধ্যে, যে মানুষেরা গুহ্যজ্ঞানশূন্য প্রাচীন ভারতের দোহাই দিয়ে এই ঐতিহ্যকে নাকচ করে দেন।

সারসংক্ষেপ

১। গত কয়েক শতক ধরে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদে দৃষ্টি ছিল প্রাচীন ভারতের দিকে, কারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইংরেজি শিক্ষা পেয়ে আর খ্রিষ্টধর্মের বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়ে তাঁদের 'নিরক্ষর' দেশবাসীর জন্য লজ্জা অনুভব করলেন এবং তাঁদের প্রতি গোপন করলেন ঘৃণা বা অবজ্ঞার মনোভাব। এছাড়াও তাঁরা হিন্দুর ক্ষমতাহানির জন্য দোষ দিলেন মুসলিম আক্রমণকে। এভাবেই এই পুনরুজ্জীবনবাদের প্রকৃতি হল গোষ্ঠীতান্ত্রিক। একদিকে এর ফল হল

হিন্দু-মুসলিম বিভাজন। অন্যদিকে এটি সৃষ্টি করল জনসাধারণের নানাধর্মের বিচিত্র সংস্কৃতির ঐতিহ্যের প্রতি ঘৃণা।

২। আম্বেদকরও ফিরে গেলেন প্রাচীন ভারতের দিকে, তবু তাঁর লক্ষ্য ছিল এমন এক ঐতিহ্যে যা ব্রাহ্মণবিরোধী এবং যা বেদের কর্তৃত্বকে স্বীকার করেনি। তাঁর এটা চোখে পড়ল না, যে সে-সময় জনসাধারণ সেই কর্তৃত্ববাদবিরোধী ঐতিহ্যের কিছু নিদর্শনকে ধরে রেখেছিলেন (এমন কি এখনও ধরে রেখেছেন)। অলকটের নিউ ইংল্যান্ড পিউরিটানবাদ আর ডিউই -এর মতাশ্রয়ী যুক্তিবাদ মিশিয়ে তৈরি তাঁর বৌদ্ধধর্ম দলিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থানে সহায়ক হয়েছিল ঠিকই, তবে দরিদ্র দলিতদের কোন কাজে লাগেনি। আর সব মিলিয়ে দেখলে বৌদ্ধধর্মও তো তখন একটি কর্তৃত্ববাদী ধর্ম।

৩। কোন ধরনের ঐতিহ্যে জনসাধারণের পক্ষে উপযোগী, তা ঠিক করতে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটা চটজলদি টোটকা নিয়মে আসার চেষ্টা করা যেতে পারে। যে ঐতিহ্য গোষ্ঠীতন্ত্রিক এবং যা বর্তমানে ভারতের বহুসংস্কৃতি বহুধর্মের সমন্বিত সত্তাকে উপেক্ষা করে, তা ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। আরও বিশেষ করে বললে, যে কোন ঐতিহ্যে যা মধ্যযুগকে অবজ্ঞা করে, অবজ্ঞা করে ইসলামকে, অবজ্ঞা করে সে যুগের সন্ত ঐতিহ্য, সুফিবাদের ইসলামী ঐতিহ্যে, শিখ ঐতিহ্যে এবং দক্ষিণের লিঙ্গায়ত ঐতিহ্যকে আর ফিরে যায় শুধু 'প্রাচীন ভারতে', তা জনসাধারণের কোন কাজে লাগবে না, এমন কি - জনসাধারণের পক্ষে ক্ষতিকরও হতে পারে। এমন ঐতিহ্যের মধ্যে আছে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ, আর্য সমাজ, ব্রাহ্ম সমাজ এবং রামকৃষ্ণ মিশন ও বৌদ্ধ পুনরুজ্জীবনবাদ।

৪। বাছাইটা মোটেই নয় যুক্তিবাদ আর অযুক্তিবাদের মধ্যে, নাস্তিকতা আর আস্তিকতার মধ্যে অথবা বস্তুবাদ আর ভাববাদের মধ্যে। আসল বাছাইটা হল কর্তৃত্ববাদী ও কর্তৃত্ববাদবিরোধী ঐতিহ্যের মধ্যে। এবং জনসাধারণের স্বাধীনভাবে বাছাই করার প্রবণতা পরেরটিকেই।

আমি চন্ডালী - সে যে মিথ্যা

ইরাবন বসুরায়

[চন্ডালিনীর কবিতা -কল্যানী ঠাকুর / প্রথম প্রকাশ: বইমেলা ২০১১। প্রকাশক: বাংলা দলিত সাহিত্য সংস্থার পক্ষে দেবাশীষ মন্ডল, ২২ ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা -৭৩: কল্যাণী ঠাকুর। মূল্য : ৪০ টাকা]

রবীন্দ্রনাথের 'চন্ডালিকা'-য় প্রকৃতি আনন্দের কাছে জেনেছিল ' মানবের বংশ তোমার/মানবের রক্ত তোমার নাড়ীতে।' রবীন্দ্রনাথ একথা বলিয়েছিলেন তাঁর নাট্যের চরিত্রকে দিয়ে, কিন্তু গোটা ভারতবর্ষের দিকে তাকালে দেখা যাবে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের নাগপাশে সত্য কণ্ঠরুদ্ধ, এখানে কোনো প্রকৃতির অধিকার নেই একথা বলার 'আমি চন্ডালী' - সে যে মিথ্যা, সে যে মিথ্যা/ সে যে দারুণ মিথ্যা।' জাতিভেদের মিথ্যাকে অস্বীকার করে শুধু ' মানব' পরিচয়ে বাঁচতে পারা - সে বোধহয় এখনো বহুদূর স্বপ্ন। তাহলে কি ওই অভিজ্ঞানেই তাঁরা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মোকাবিলা করবেন তার? সেটাও তো একটা প্রতিবাদ। উচ্চবর্ণের সমাজের নিন্দাও তাঁদের আত্মপরিচয়ের হাতিয়ার। কল্যাণী ঠাকুর তাই কি তাঁর কবিতার বইয়ের নাম রাখেন 'চন্ডালিনীর কবিতা!'

সে-কবিতায় তিনি বলেন ' ভোরের পাখি ডাক দিয়ে যাই/ কালোমানুষ জাগো/ হাজার বছর ঘুমিয়ে থাকা/ মানুষের দল জাগো।' অথচ সেই মানুষের দলে কি তাকে জায়গা দেওয়া হয়। অবরুদ্ধ ক্ষোভ বেরিয়ে আসে তাঁর উচ্চারণে ' আমার ঠাকুরদাকে টোলের চৌহদ্দিতে ঢুকতে দেওয়া হয়নি / ... আমার মাকে বাঁ হাতে গোবর নিয়ে/ ঠাকুর বাড়ি দুর্গাপুজোর প্রসাদ আনতে যেতে হত।' (কবিতা সংখ্যা ৩৩) মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে কবি বন্দ্যঘাটি গাঁইকে শাস্তি পেতে হয়েছিল তার কবি হওয়ার চেষ্টার জন্য, আর একালে তাদের '... গলা টিপে / বলতে শেখান হচ্ছে - বল আমরা সব এক, এখানে কিছু নেই'(৩৩) :

শুধু কি তাঁর সমাজগত পরিচয়ের উপেক্ষা, তাঁকে তো মনে রাখতে হয় তিনি নারী - পুরুষতন্ত্রের চাপও তো তাকে সহ্য করতে হয়, অথচ সে তো এক যন্ত্রণার ইতিবৃত্তও বটে। 'আমি তো সেই মেয়ে/ যে রক্তাক্ত যোনি উন্মুক্ত করে / বলি প্রিয় পুরুষ এই আমি/ ধরিত্রী তুই চাষ কর ...' (২৩), কিন্তু এই কামনা কি কোনো পূর্ণতা পায়। কেন তাঁকে বলতে হয় ' বিনিদ্র / রাত্রি যাপন শুধু স্বপ্ন আর সত্যির/ মাঝে দাঁড়ানো পেন্ডুলামে' (২৩)।

কখনো অভিমানে রক্তাক্ত হওয়া; কখনো অভিযোগে অস্থির হওয়া এসবই কল্যাণীর কবিতার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সবসময়ই তিনি কথা বলেন তাঁর স্বভূমিতে দাঁড়িয়ে, কোনো পরকালের জন্য তিনি লালায়িত নন। চলে যাওয়ার কথা অবশ্য মাঝে মাঝে উচ্চারণ করেছেন তিনি - 'তবু আমি ছেড়ে যেতে চাই এই নদী, এই/ আকাশ আমার এই কালাতীত ঘনিষ্ঠ সন্ধ্যা' (৩), অথবা ' ছেড়ে যাছি আমি এই জলজঙ্গল/ জঙ্গলের মানুষজন / ... আমি চলে যাব চার নদী পাঁচ/ জনপদ ছেড়ে'(২), তবু বোঝা যায় এ ঠিক যাওয়া নয়, বরং এতে মিলে থাকে এক অসহায়ত্বের আর্তি। আসলে তো তাঁর যাওয়া অন্য এক বাসনায় অঙ্গীকৃত - ' আমি তো মুক্তিকামী / তাই একা ভাসায়েছি নাও/ দেশান্তরে যাব বলে/ বয়ে চলি দূর নদী সাগরের পার' (১১)। মুক্তির আকাঙ্খায় যাবতীয় বন্ধন থেকে বেরিয়ে যাত্রা শুরু করতে চান এই কবি।

অভিযোগ আর প্রতিবাদের পাশাপাশি কোনো কোনো লেখায় ধরা পড়ে তার নিভৃত উচ্চারণ। সহজেই তিনি বলতে পারেন ' আমি তখন অষ্টাদশী / তোমার বয়স কত/ অনন্তকাল একপথে/ জল ঝরছে অবিরত'(৪০), বা ' জীবনের পাওয়ার বিচার / না পাওয়ার হিসেব চুকিয়ে / পাশ ফিরে শুই / আর পরদিন জাগব না এমন / প্রতিজ্ঞায় প্রতিরাতে বালিশ ভেজাই ' (১৯)। বলতে পারেন ' যাও বলে ছেড়ে দিলেই কি দূর করা হয়,/ সে তো অনেক নিকট আজ / মনের গহনে - / ' যাও পাখি বলে দূরে/ দিতে পারিনি যে তারে -'(৩১) কিন্তু এই সব নিভৃত উচ্চারণকে তিনি বেশি প্রশ্রয় দিতে পারেননি, কেননা ' চাঁদের কোলে বাস / জীবন যাদের অমানিশা'(৩৪)। ' কেশরাশি ধরে আছে/ মুখখানি আদরের

ঢঙে/ দেখে যেন মনে হয় / বহুদিন পর পুরনো / প্রেমিক দেখে প্রেয়সীর তার/ নতুন চিকুরে - ' (৪৪)। এই উচ্চারণ একটু দুর্বল শোনালেও এতে আছে এক রূপানুভবের মায়া, কিন্তু সে অনুভব যেন জায়গা পায় না, যেন সে সুযোগ জীবনে সেভাবে আসে না।

কল্যাণী তাই বারবার বিদ্ধ হন, আহত হন। তার উচ্চারণে আনন্দ নেই, বিষাদ আছে; অভিমান নেই, ক্রোধ আছে। আর একথা তো মানতেই হবে বিষাদ, ক্রোধও কবিতার অন্তর্লীন উপাদান হতেই পারে। যে জীবনের কথা বলতে চান কল্যাণী, সেই জীবন যাদের চাপে তৈরি হয়, দায় তাদেরই। কল্যাণী তো তাদের চিহ্নিত করতে চেয়েছেন :

সেখানে বোধহয় একটা বিপদের সম্ভাবনাও থেকে যায়। কল্যাণী তো কবিতা লিখতে চেয়েছেন। কবিতা তো শুধুই অনুভবের প্রকাশ নয়, তাকে হয়ে উঠতে হয়। কবিতা নিরাভরণ হতে পারে, সহজ হতে পারে, কিন্তু সেই উচ্চারণগুলি শোনাতে হবে কবিতার ভাষায়। সেখানে কল্যাণী দুর্বল, খুব সরল আবেগে তিনি তাঁর সৎ অনুভূতির কথা বলে গেছেন, মনে রাখেননি তা কোথাও কোথাও বিবৃতি হয়ে যাচ্ছে। কবিতা হয়ে ওঠে। সেই হয়ে ওঠার পিছনে থেকে যায় তার নির্মাণ কৌশল। তাৎক্ষণিক স্টেটমেন্ট ছাড়িয়ে তাকে গভীরতায় নিয়ে যেতে না পারলে তা পাঠকের মনে প্রত্যাশিত আলোড়ন তুলতে পারে না। কল্যাণীকে সেদিকটা খেয়াল করতে হবে। তখনই চন্ডালিনীর কথা ' চন্ডালিনীর কবিতা' হয়ে উঠবে।

গণতান্ত্রিক দেশে এসব কী হচ্ছে

বিজয়া করসোম

কেমন আছেন খবিরুন নেছা? সামাদ আলি? বা, তাদের চার মেয়ে? এই এখন, ২০১১ সালে? গত বছরের 'বিশ্ব মানবাধিকার দিবস' - এই বা কেমন ছিলেন তারা? আমরা শুধু কল্পনা করতে পারি, ভাবতে পারি তাদের নিয়ে। কিন্তু তাদের কষ্ট, অপমান, আশঙ্কার সাথে মিলেমিশে যেতে পারি না।

কী হয়েছিল তাদের? ঘটনাটা ভারতের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত আসাম রাজ্যের। এখানকার এক দৈনিক 'সাময়িক প্রসঙ্গ' - তে তাদের নিয়ে লিখেছিলেন ফজলুজ্জামান মজুমদার - ... "কুমরির এক প্রান্তিক দিনমজুর হলেন সামাদ আলি। তার বয়স ছাপান্ন। সামাদ আলি এবং তার চার মেয়ে সবাই ভারত সরকারের স্বীকৃত নাগরিক। হ্যাঁ, তার স্ত্রী খবিরুন নেছাও ভারতীয় নাগরিক ছিলেন। তবে ১৯৯৭ সালের আগে পর্যন্ত। '৯৭ সালের নির্বাচন কমিশনের স্ক্রুটিনির আওতায় চলে আসে খবিরুন নেছার নাগরিকত্ব। ভোটার তালিকায় স্ত্রীর নামের পাশে আচমকা ডি মার্কিং আবিষ্কার করেন সামাদ আলি। বাংলাদেশ সীমান্ত টপকানো অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে মামলা দায়ের করে পুলিশ।

থানা-পুলিশের হাত ধরে মামলা চলে যায় ট্রাইবুনালে। ... সামাদ আলির চোখের সামনে তার স্ত্রীকে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। তারপর তাকে সোজা ডিটেনশন ক্যাম্পে চালান করে দেওয়া হয়।" এটা শুধু এক খবিরুন নেছা-র কাহিনী নয়। এরকম কত খবিরুন - রা আসামের বিভিন্ন জেলায় তখন ' বিদেশি', ' সন্দেহভাজন' হয়ে যান, তা জানতে খবরের কাগজ-ই যথেষ্ট। ইন্টারনেট ঘাঁটতে হয় না। অথচ ' ১৯৬৬ সালের ভোটার তালিকায় সামাদ আলির বাবা জামাত আলির নাম রয়েছে। সামাদ আলিও নিয়মিত ভোট দিয়ে আসছেন। চার মেয়ের সবাই আইনসিদ্ধ ভারতীয় নাগরিক। স্ত্রীকে যে কেন বাংলাদেশি সন্দেহে আটকে রেখেছে, সামাদ কিছুতেই বুঝতে পারছেন না। খবিরুন নেছার

বাবা খহেজউদ্দিন দেশভাগের সময় থেকে গোয়ালপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন। বর্তমানে ভদ্রলোক বেঁচে নাই। ... এতসব প্রামাণ্য নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও স্ত্রী কেমন করে বাংলাদেশি হয়ে গেলেন? ট্রাইবুনালের বিচারপতির এজলাসে হাজারবার প্রশ্ন তুলেও সদুত্তর পাননি সামাদ।' আমাদের মনেও প্রশ্ন আসে, সংখ্যালঘু, গরিবরা কি এই রাজ্যে থাকতে পারবেন না আর? তাদের বাঁচার পথ ক্ষতবিক্ষত করে দেবার অধিকার কী করে পান দেশের শাসনকর্তারা?

ফজলুজ্জামান লিখেছেন - 'অসহ্য জীবনযন্ত্রণার কথা বলতে গিয়ে চোখের জল আটকাতে পারেননি সামাদ। তার বাঁচাপাকা দাড়ি বেয়ে টপটপ করে পড়তে থাকে জমাটবাঁধা বরফের মতো সীমাহীন যন্ত্রণা।' বার বার হয়তো তাঁর মনে পড়ে যাচ্ছে কত সুখস্মৃতি। দুজনের একসঙ্গে ঘর করার প্রথমদিকের দিনগুলিতে তো একবারও মনে হয়নি তাদের কারো যে এরকম ঘটে যেতে পারে। এরকমভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন দুজন। তাদের হয়ে কে কথা বলবে? আইনি মারপ্যাঁচ তারা জানেন না, বুঝেন না। পয়সাকড়িও তেমন নেই যে জাঁদরেল এক উকিল খুঁজবেন। ডিটেনশন ক্যাম্পের নোংরার মধ্যে পড়ে থেকেই কি একদিন খবিরুন নেছার জীবনাবসান হবে? আর সামাদ? কখনো খবিরুনকে কাছে পাবেন না। মেয়েগুলি কী বলে সান্ত্বনা খুঁজবে? আমরা-ই বা কী করে আস্থা রাখবো মহান ভারত রাষ্ট্রের সংবিধানের উপরে।

(খ)

কেমন আছেন সেই নাম না জানা দর্জি পরিবারের মানুষজন? কলকাতা থেকে প্রকাশিত ' মন্থন' পত্রিকায় রুমানা মাহমুদের একটি লেখায় পেলাম - ' সে ছিল এক গরিব দর্জি, বাঁচার জন্য তাকে কঠিন পরিশ্রম করতে হত। পাঁচ মেয়ের বাবা, মানুষটার শান্ত স্বভাব আর বিনীত আচরণ সবাইকে মুগ্ধ করবে। নিজের কাজটা সে বেশ ভালভাবেই করতো। প্রায় শূন্য হাতে সে শুরু করেছিল। ... একবার রমজান মাসে আমি তার কাছে গিয়েছিলাম. আমি যখন একব্যাগ কাপড়

সেলাই করার জন্য তার হাতে তুলে দিলাম, তাকে দেখে একটু দুর্বল মনে হচ্ছিল। ... সে অবশ্য তার কথা রেখেছিল। ঈদের আগেই সে আমার পোশাকগুলো সেলাই করে দিল। কিন্তু আমি যখন সেগুলো আনতে গেলাম, তখন আগের মতোই তার শঙ্কিত চাহনি ও ফ্যাকাশে মুখ দেখে আমার খুব কষ্ট লাগল। আমি তাকে সাহায্য করতে চাইলাম। কিন্তু সে হাত পেতে সাহায্য নিতে ইতঃস্তত করত।

... ঈদের পরবর্তী সময়টায় উপত্যকা উত্তাল হয়ে উঠলো। সরকার কড়া কার্ফুর নির্দেশ জারি করলো। এরমধ্যে আমি হঠাৎ একটা ফোন পেলাম - আমার মা ফুঁপিয়ে কাঁদছে - 'ওই দর্জির মৃত্যুর কারণ হলো - তাকে খুন করা হয়েছে। তার পেটের ডানদিকে ব্যথা হয়েছিল। সে কাছাকাছি এক হাসপাতালে গিয়েছিল চিকিৎসার জন্য। সেখানে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হলো। পরের দিন তার আবার পেটের ব্যথা শুরু হয়। কিন্তু সেদিন হাসপাতালে যাবার জন্য সে কোন গাড়ি পেলো না। তার অসুখ বেড়ে গেল। অ্যাপেনডিক্স ফুলে উঠে ফেটে গেল এবং তার পৌষ্টিক নালীতে ইনফেকশন ছড়িয়ে গেল।

... কোন বুলেট এই দর্জির শরীর ফুঁড়ে দেয়নি, কোন বিস্ফোরকের টুকরো ছুটে এসে তাকে আঘাত করেনি, কোন অত্যাচারীর চাবুক তার দেহে আছড়ে পড়েনি। তাকে কেউ 'শহিদ' বলবে না। কোন সরকারি সংস্থা তাকে ক্ষতিপূরণ দেবে না। এই গ্রীষ্মে উপত্যকায় যে ১১১ জনের মৃত্যু হয়েছে, তাদের তালিকায় তার নাম নেই।" এই নিরপরাধ মানুষটাকে হত্যা করার দায় কে নেবে? এই দর্জির উপযুক্ত স্থান তাহলে কোথায়? কোন তালিকায়? দর্জির বৌ আর পাঁচটা মেয়ের ভাগ্যে কী আছে? কেউ কি এই মৃত্যুর দায় ঘাড় পেতে নেবে?

এ চিত্র তো শুধু কাশ্মীরের নয়। মণিপুর-গুজরাট-হরিয়ানা-জঙ্গলমহল, এককথায় আজ দেশের প্রায় সর্বত্র সাধারণ মানুষ অ-নিরাপত্তায় ভুগছেন। তারা জানেন না, জানতে পারেন না, বিপদ কীভাবে কোথায় লুকিয়ে আছে। কোথাও কৃষিজমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, কোথাও নদী বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে

কোথাও বা বাঁধিয়ে দেওয়া হচ্ছে দাঙ্গা। আবার কোথাও চলছে সেনাবাহিনীর উদ্দাম নৃত্য। সবকিছুই ঘটছে রাষ্ট্রীয় মদতে ও উৎসাহে। তাই সাধারণ মানুষ দিশেহারা। কোথায়, কার কাছে গিয়ে আশ্রয় নেবেন? কে বা কারা দিতে পারবে তাদের ভরসার আশ্বাস?

(গ)

কিন্তু এমন কি হবার কথা ছিলো? ১৭৭৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে সমস্ত মানুষকে সমান বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। সঙ্গে এটাও বলা হয় যে, জীবন স্বাধীনতা ও সুখের অন্বেষণ মানুষের অবিচ্ছেদ্য অধিকার। ভারতে মানবাধিকার আন্দোলনের সূচনা ঘটেছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে। মুম্বাইয়ে, ১৯১৮ সালে, কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে। বাক্ স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা, আইনানুগ বিচার পাবার স্বাধীনতা, জাতিগত বৈষম্য থেকে মুক্তি ইত্যাদির দাবি তোলা হয় সেখানে। উদ্‌যাপিত হলো ' নিখিল ভারত নিপীড়িত রাজনৈতিক কর্মী দিবস' ১৯২৯ সালে। সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন এর উদ্যোক্তা।

এলো ১৯৩১ সাল। কলকাতার মনুমেন্টের নিচে এক ঐতিহাসিক জনসভায় রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদী ভাষণ দেন। সেই সভা থেকে একটি ' নাগরিক কমিটি' গঠিত হয়। এর দাবি ছিল রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি ও নাগরিক স্বাধীনতা। সময় থেমে থাকে না। দাবিদাওয়ারও চরিত্র বদল হয়। গঠিত হয় ' সারা ভারত নাগরিক স্বাধীনতা সংঘ'। জহরলাল নেহরু ছিলেন এই সংঘের মূল আহ্বায়ক। সভাপতি ছিলেন স্বয়ং বিশ্বকবি। একুশ সদস্যের এক কার্যকারী সমিতিও গঠিত হয়। ' ভারত ছাড়ো' আন্দোলন পর্যন্ত এই সংগঠন টিকেছিলো। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘে গৃহীত হয় ' বিশ্ব মানবাধিকার সনদ'/ যাতে ভারতকে পাওয়া যায় অন্যতম সাক্ষরকারী দেশ হিসেবে।

কিন্তু স্বাধীন ভারতেও মানুষ রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের হাত থেকে রেহাই পেলো

না। 'এ আজাদি ঝুটা হ্যায়' বলে যারা আওয়াজ তুললেন, তারাই প্রথমে নিপীড়িত হলেন। পরে ধীরে ধীরে জারি হলো 'অন্ধ্রপ্রদেশ সাপ্রেশন অব ডিস্টার্বিং অ্যাক্ট ১৯৪৮', 'পিডি অ্যাক্ট ১৯৫০', 'ডি আই রুলস ১৯৬২', 'মিসা ১৯৭১', 'এন.এস অ্যাক্ট', 'টাডা ১৯৮৫', ইত্যাদি। গতবছর পাশ হয়ে গেলো আরো দুটি আইন। এর একটি হলো 'জাতীয় তদন্ত সংস্থা গঠন আইন' ও অন্যটি ' ইউএপিএ - ২০০৮'। বলা হচ্ছে, এসবের উদ্দেশ্য সন্ত্রাস দমন। কিন্তু সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞাই এখনো পরিষ্কার করে কোথাও বলা হয়নি। ভারতবাসী দেখছে, এ আসলে ভারতীয় জনসমাজকে ক্ষতবিক্ষত করে দেওয়ার কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। মুষ্ঠিমেয় মানুষের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার প্রচেষ্টায় শাসকগোষ্ঠী এ আইন দুটির আশ্রয় নিচ্ছে।

আরো এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও ইদানীং দেখতে পাচ্ছেন ভারতের জনগণ। বিখ্যাত সব মানবাধিকার কর্মীরা রাষ্ট্রের হাতে নিপীড়িত হচ্ছেন। যেমন বিনায়ক সেন, হিমাংশু কুমার, মেধা পাটেকর, অরুন্ধতী রায়, শর্মিলা চানু প্রমুখ। তাঁদের প্রায় সকলের বিরুদ্ধেই ঝুলছে নানা ধরনের মামলা। অথচ দুর্নীতি-কেলেঙ্কারি -পাচার - ধর্ষণ ইত্যাদির সাথে জড়িত মন্ত্রী - বিধায়ক - আমলাদের কোন শাস্তির ব্যবস্থা হয় না। বরং তাদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি হয়, সুযোগ সুবিধা বাড়ে। এ এক অদ্ভুত সময়। মানবাধিকার কর্মীরা হয় জেলে, না হয় জেলে যাবেন বলে হুমকি পাচ্ছেন। মন্ত্রী - বিধায়কদের সুখ উপচে পড়ছে। সাধারণ, খবিরুদ্ধ নেহারা রোজ অত্যাচারিত হচ্ছেন, খুন হচ্ছেন, মারা যাচ্ছেন। কোন রাস্তায়, কীভাবে এ দুঃসময় থেকে রক্ষা পাবে দেশ কে জানে। কত কত ভোর পেরোলে পরে এ দেশে সত্যিই সবার বেঁচে থাকার, স্বাধীনভাবে মাথা উঁচু করে চলার অধিকার পাওয়া যাবে? এ প্রশ্নের উত্তর কোথায় পাওয়া যাবে কে জানে ...!

জাতির অগ্রগতিতে প্রথম মহিলা ডাক্তার কাদম্বিনীর ভূমিকা সার্ধ-জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

আনন্দময়ী মুখোপাধ্যায়

১৮৬১ না ১৮৬২ কবে কাদম্বিনী এসেছিলেন উদারচেতা ব্রজকিশোর বসুর ঘরে, বিহারের ভাগলপুরে না বরিশালের চাঁদসীতে, তা কেউ সঠিক বলতেই পারেন না, তারিখ মাসের তো কোনো হদিশই নেই। কিন্তু উনিশ শতকের সেই রেনেসাঁসের সময় অনেক অনেক নক্ষত্রের শোভা যখন বাংলার আকাশকে উদ্ভাসিত করেছে সেই সময় কয়েকজন পুরুষ চাইলেন সাথে নারীদের নিয়ে এগিয়ে চলতে। যে আশ্চর্য তারকাটি সমগ্র নারীজাতিকে, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি কাদম্বিনী বসু গঙ্গোপাধ্যায়। কোথাও কোনো বাধা তাকে দমাতে পারে নি, হার স্বীকার করেন নি কোথাও। সমগ্র জাতির সামনে এক দীপ্যমান শিখা জ্বালিয়ে রেখেছেন। মূলতঃ চিকিৎসায় তাঁর অসামান্য অবদান - সাথে রাজনীতি, শিক্ষা, সমাজসংস্কার, নারী প্রগতি সর্বত্র। তিনি সুগৃহিনী ও স্নেহশীল মাতাও।

যেহেতু আমরা তাঁর জন্মদিন জানি না তাই সারাবছরই তাঁকে সার্ধ শতবর্ষের প্রণাম জানাব যে কোন দিনে।

কাদম্বিনীর সকল কাজের অদম্য উৎসাহের প্রেরণা ছিলো স্বদেশী সেবী ও নারীপ্রগতির স্তম্ভস্বরূপ স্বামী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৮৮৩ তে কাদম্বিনী এবং চন্দ্রমুখী বসু প্রথম ভারতীয় পরীক্ষার্থিনী হিসাবে বি.এ পাশ করেন। এই বছরই তিনি তাঁর শিক্ষক দ্বারকানাথকে পতিত্বে বরণ করেন। দ্বারকানাথের মতো নারী হিতৈষী ব্যক্তি দুর্লভ ছিলো। প্রতিভাময়ী কাদম্বিনীর সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় নিজের স্বপ্নকে সাকার করতে সক্ষম হন। সে যুগে স্বামীর আগ্রহ ছাড়া একজন মেয়ের স্বাধীনভাবে একটি পথ খুঁজে পাওয়া সহজ ছিলো না। এ যুগেও চরম সাফল্য পেতে হলে নারীপুরুষ উভয়েরই জীবনসঙ্গীর উৎসাহ ও প্রেরণা

না।'এ আজাদি ঝুটা হ্যায়' বলে যারা আওয়াজ তুললেন, তারাই প্রথমে নিপীড়িত হলেন। পরে ধীরে ধীরে জারি হলো 'অন্ধ্রপ্রদেশ সাপ্রেশন অব ডিস্টার্বান্স অ্যা ১৯৪৮', 'পিডি অ্যাক্ট ১৯৫০', 'ডি আই রুলস ১৯৬২', 'মিসা ১৯৭১', 'এন.এ অ্যাক্ট', 'টাডা ১৯৮৫', ইত্যাদি। গতবছর পাশ হয়ে গেলো আরো দুটি আইন এর একটি হলো 'জাতীয় তদন্ত সংস্থা গঠন আইন' ও অন্যটি ' ইউএপিএ - ২০০৮'। বলা হচ্ছে, এসবের উদ্দেশ্য সন্ত্রাস দমন। কিন্তু সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞাই এখনো পরিষ্কার করে কোথাও বলা হয়নি। ভারতবাসী দেখছে, এ আসলে ভারতীয় জনসমাজকে ক্ষতবিক্ষত করে দেওয়ার কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। মুষ্ঠিমেয় মানুষের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার প্রচেষ্টায় শাসকগোষ্ঠী এ আইন দুটির আশ্রয় নিচ্ছে।

আরো এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও ইদানীং দেখতে পাচ্ছেন ভারতের জনগণ: বিখ্যাত সব মানবাধিকার কর্মীরা রাষ্ট্রের হাতে নিপীড়িত হচ্ছেন। যেমন বিনায়ক সেন, হিমাংশু কুমার, মেধা পাটেকর, অরুন্ধতী রায়, শর্মিলা চানু প্রমুখ। তাঁদের প্রায় সকলের বিরুদ্ধেই ঝুলছে নানা ধরনের মামলা। অথচ দুর্নীতি-তেলেঙ্গারি -পাচার - ধর্ষণ ইত্যাদির সাথে জড়িত মন্ত্রী - বিধায়ক - আমলাদের কোন শাস্তির ব্যবস্থা হয় না। বরং তাদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি হয়, সুযোগ সুবিধা বাড়ে। এ এক অদ্ভুত সময়। মানবাধিকার কর্মীরা হয় জেলে, না হয় জেলে যাবেন বলে হুমকি পাচ্ছেন। মন্ত্রী - বিধায়কদের সুখ উপচে পড়ছে। সামাদ, খবিরুন নেছারা রোজ অত্যাচারিত হচ্ছেন, খুন হচ্ছেন, মারা যাচ্ছেন। কোন রাস্তায়, কীভাবে এ দুঃসময় থেকে রক্ষা পাবে দেশ কে জানে! কত কত ভোর পেরোলে পরে এ দেশে সত্যিই সবার বেঁচে থাকার, স্বাধীনভাবে মাথা উঁচু করে চলার অধিকার পাওয়া যাবে? এ প্রশ্নের উত্তর কোথায় পাওয়া যাবে কে জানে ...!

জাতির অগ্রগতিতে প্রথম মহিলা ডাক্তার কাদম্বিনীর ভূমিকা সার্ধ-জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

আনন্দময়ী মুখোপাধ্যায়

১৮৬১ না ১৮৬২ কবে কাদম্বিনী এসেছিলেন উদারচেতা ব্রজকিশোর বসুর ঘরে, বিহারের ভাগলপুরে না বরিশালের চাঁদসীতে, তা কেউ সঠিক বলতেই পারেন না, তারিখ মাসের তো কোনো হদিশই নেই। কিন্তু উনিশ শতকের সেই রেনেসাঁসের সময় অনেক অনেক নক্ষত্রের শোভা যখন বাংলার আকাশকে উদ্ভাসিত করেছে সেই সময় কয়েকজন পুরুষ চাইলেন সাথে নারীদের নিয়ে এগিয়ে চলতে। যে আশ্চর্য তারকাটি সমগ্র নারীজাতিকে, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি কাদম্বিনী বসু গঙ্গোপাধ্যায়। কোথাও কোনো বাধা তাকে দমাতে পারে নি, হার স্বীকার করেন নি কোথাও। সমগ্র জাতির সামনে এক দীপ্যমান শিখা জ্বালিয়ে রেখেছেন। মূলতঃ চিকিৎসায় তাঁর অসামান্য অবদান - সাথে রাজনীতি, শিক্ষা, সমাজসংস্কার, নারী প্রগতি সর্বত্র। তিনি সুগৃহিনী ও স্নেহশীল মাতাও।

যেহেতু আমরা তাঁর জন্মদিন জানি না তাই সারাবছরই তাঁকে সার্ধ শতবর্ষের প্রণাম জানাব যে কোন দিনে।

কাদম্বিনীর সকল কাজের অদম্য উৎসাহের প্রেরণা ছিলো স্বদেশী সেবী ও নারীপ্রগতির স্তম্ভস্বরূপ স্বামী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৮৮৩ তে কাদম্বিনী এবং চন্দ্রমুখী বসু প্রথম ভারতীয় পরীক্ষার্থিনী হিসাবে বি.এ পাশ করেন। এই বছরই তিনি তাঁর শিক্ষক দ্বারকানাথকে পতিত্বে বরণ করেন। দ্বারকানাথের মতো নারী হিতৈষী ব্যক্তি দুর্লভ ছিলো। প্রতিভাময়ী কাদম্বিনীর সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় নিজের স্বপ্নকে সাকার করতে সক্ষম হন। সে যুগে স্বামীর আগ্রহ ছাড়া একজন মেয়ের স্বাধীনভাবে একটি পথ খুঁজে পাওয়া সহজ ছিলো না। এ যুগেও চরম সাফল্য পেতে হলে নারীপুরুষ উভয়েরই জীবনসঙ্গীর উৎসাহ ও প্রেরণা

একান্তই জরুরি। সমসাময়িক অনেকের মতে কাদম্বিনীর অসাধারণ মেধার সাথে দ্বারকানাথের উৎসাহ ও প্রেরণা কাদম্বিনীর সফল জীবনের পাথেয়।

কলকাতা মেডিকেল কলেজেও তিনি প্রথম ছাত্রী। মেডিকেল কলেজের কাউন্সিল তাঁকে ভর্তি হতে দিতে চায় নি - অধ্যাপকদের অনেকেই অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন - তার জের হিসেবে ১৮৮৮ খৃঃ মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় একজন অধ্যাপক তাঁকে মেডিসিন-এ ফেল করিয়ে দেন। ফলে এম.বি ডিগ্রী পান না। জি বি এম সি (গ্র্যাজুয়েট অব বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ) উপাধি পান। এই অপমান ভুলতে ১৮৯২ সালে ইংলন্ড যান। পরের বছর এল.আর.সি.পি (এডিনবরা) এল. আর.সি.এস গ্লাসগো এবং ত্রি.এফ.পি.এস (ডাবলিন)উপাধি নিয়ে ফেরেন।

সুন্দরী দীর্ঘাঙ্গী কাদম্বিনী অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মহিলা ছিলেন এবং চিকিৎসক হবার মতো যোগ্য ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী ছিলেন। সেযুগে পূর্ণ মর্যাদা নিয়ে ক্লাস করতেন। কখনও অশালীন ব্যবহারের সম্মুখীন হয়েছিলেন এমন কথা শোনা যায় নি। লেডি ডাফরিন মেয়েদের ডাক্তারি পড়া ও রোগিনীদের চিকিৎসার জন্য 'ফাউন্টেস অব ডাফরিনস ফান্ড' নামে একটি তহবিল খোলেন। এই তহবিলে সাত লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছিল। কলকাতায় কাদম্বিনী একাই সংগ্রহ করেন চব্বিশ হাজার টাকা।

বঙ্গবাসী পত্রিকাগোষ্ঠী ভব্যতার সীমা না রেখে কাদম্বিনীর চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করে। 'বঙ্গনিবাসী' পত্রিকার সম্পাদক মহেশ চন্দ্র পাল বাড়াবাড়ি করে গালাগালি দিলেন তাঁকে ব্রাহ্মসমাজের জঘন্য নিদর্শন ও পতিতা বলে। কাদম্বিনী মেয়ে বলে সব ছেড়ে দেবার পাত্রী নন। পিছনে ছিলেন দ্বারকানাথ। মানহানির মামলা করলেন বঙ্গনিবাসীর সম্পাদকের বিরুদ্ধে। জয়ী হলেন। সম্পাদকের ছ মাসের কারাদন্ড ও একশত টাকা জরিমানা হলো।

মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করতে না পারার দুঃখ ঘোচাতে গ্লাসগো ও

এডিনবরা থেকে ডিগ্রী নিয়ে ফিরে আসার পর বিশেষ বাধা পান নি। শিক্ষিতদের কাছে পেয়েছিলেন সম্মান। যেখানে যেতেন সেখানেই অনেকে ভিড় করে তাঁকে দেখতে আসতো।

চন্দ্রমুখী বেথুন কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন প্রায় একই সময়ে কাদম্বিনী ডাফরিন হাসপাতালে তিনশত টাকা মাইনের চাকরি পান। এত উচ্চহারে বেতন বাঙালি পুরুষেরাও সে সময় কমই পেতেন।

দ্বারকানাথ (১৮৪৪-৯৮) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট নেতা ও নারী শিক্ষা প্রসারে উদ্যোগী ব্যক্তিত্ব। নারী মুক্তি ও বিধবা বিবাহের জন্য তাঁরা একযোগে প্রয়াসী হয়েছিলেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের মতো পন্ডিত ও প্রখ্যাত শিক্ষকদের সুযোগ্য ছাত্রী কাদম্বিনী মনে করতেন উন্নত শিক্ষাই নারী সমাজের মুক্তির বাহন হতে পারে। তিনি বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে কুটির শিল্প প্রসারে উৎসাহিত করেন। কাদম্বিনী চাইলেন ভারতীয় নারীদের দৃষ্টি প্রসারিত হোক এবং এ বিষয়ে দৃষ্টি স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি স্বয়ং ইংল্যান্ড ও আমেরিকার ঘটনাবলী বিচার বিশ্লেষণের জন্য Bengal Ladies Association - এ যোগ দেন। ১৮৮০ সালে তিনি এই সংস্থার সম্পাদিকা হন। তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের মধ্যে চন্দ্রমুখী বসু, অবলা দাস, কামিনী রায় ও স্বর্ণকুমারীর নাম উল্লেখযোগ্য।

কাদম্বিনী একই সময়ে জড়িয়ে পড়েছিলেন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে। বোম্বাইয়ের কংগ্রেস অধিবেশনে যে তিনজন বঙ্গনারী যোগ দিয়েছিলেন কাদম্বিনী তাঁদের মধ্যে একজন, অপর দুজন - স্বর্ণকুমারী দেবী ও বসন্ত কুমারী দাস। এঁদের মধ্যে একমাত্র কাদম্বিনীই উক্ত সভায় কিছু বক্তব্য রাখেন।

বাঙালী মেয়েদের মধ্যে কাদম্বিনী প্রথম চিকিৎসক। আনন্দবাঈ যোশি পেনসিলভানিয়া থেকে ডাক্তার হয়ে এসেছিলেন, কিন্তু অকালমৃত্যু তাঁকে চিকিৎসক হওয়ার সুযোগই দিলো না। অবলা দাস মাদ্রাজে গিয়েছিলেন মেডিকেল

পড়তে। দিদির মতো তাঁরও বিয়ে হয়ে যাওয়ায় পড়া হয়নি। বি.এ পাশ করার পরই কাদম্বিনীর বিয়ে হয় দ্বারকানাথের সঙ্গে, তবু লেখাপড়ায় ছেদ পড়লো না। ভর্তি হলেন মেডিকেল কলেজে। সংসার দেখা, সন্তান পালন ও তার সঙ্গে ডাক্তারী সবই একযোগে নিষ্ঠার সঙ্গে করে গেলেন কাদম্বিনী। দ্বারকানাথের প্রথম স্ত্রীর কন্যা বিধুমুখীর বিয়ে হয়েছিল উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সঙ্গে। কাদম্বিনী নিজের কথা না লিখলেও নাতনি অর্থাৎ বিধুমুখীর মেজো মেয়ে পুণ্যলতার কলমে কাদম্বিনীর স্নেহময়ী জননী রূপটি ফুটে উঠেছে -

'দিদিমা কবে যে বিলেত গেছিল মনে নেই, কিন্তু তাঁর ফিরবার দিনটি বেশ মনে পড়ে। বাড়িতে ঢুকেই দুহাত বাড়িয়ে জংলুমামাকে কোলে নিতে গেলেন। ছোট্ট একবছরের জংলুমামাকে তাঁর মায়ের কাছে রেখে দিদিমা বিলাত চলে গিয়েছিলেন, এখন সে ছেলে মাকে চিনতে পারছে না।'

বিলেত থেকে আসার সময় কাদম্বিনী ছোটো বড়ো সকলের জন্য কিছু না কিছু উপহার এনেছিলেন। একদিকে খুব সাহসী আর তেজস্বিনী, অন্যদিকে আমুদে মানুষ কাদম্বিনীকে সকলেই ভালবাসতেন। তাঁর লাবণ্যময় ব্যক্তিত্ব সকলকে মুগ্ধ করে রাখতো। পুণ্যলতার ভাষায় মাতৃভাষার মতোন সুন্দর অনর্গল ইংরেজি বলতে পারতেন। তখনকার সবচেয়ে আধুনিক ফ্যাশনের শাড়ি জামা জুতো পরে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতেন। তা বলে ঘরের কাজেও বিরাম ছিলো তা নয়। রান্না, সেলাই সবই জানতেন। একটুও সময় নষ্ট করতেন না। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর সাতটি ছোট ছোট সন্তানকে একাই মানুষ করেছিলেন অনায়াসে। তিনি যে বিধুমুখীর বিমাতা সেকথা পুণ্যলতা বুঝতে পারতেন না। শুধু দেখতেন ঘরের কাজ, দেশ সেবা, সমাজ সেবা, ডাক্তারি , লেস বোনা সবই সমানতালে এগোচ্ছে।

পুণ্যলতার শিশুমনের পটে কাদম্বিনীর জীবন চিত্রের যে কোমলরেখা ধরা পড়েছে তার মূল্য অপরিসীম। কাদম্বিনী একবার নেপালের রাজমাতাকে চিকিৎসা করে মরণাপন্ন অবস্থা থেকে বাঁচিয়েছিলেন। তারা খুশি হয়ে নির্দিষ্ট টাকার

উপরেও অনেক দামী দামী উপহার দিলেন। সেকথাও পুণ্যলতা জানান।

কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে যে নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন কাদম্বিনী। ১৯০৮ সালে তিনি কলকাতায় এক জনসভার আয়োজন করেন। তিনি নিজে এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। গান্ধিজির নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভালে আন্দোলনরত সত্যাগ্রহীদের প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। এইসব সত্যাগ্রহীর সহায়তাকল্পে তিনি একটি সভাও গঠন করেন এবং অর্থ সংগ্রহে উদ্যোগী হন। ১৯১৪ সালে গান্ধিজির কলকাতা ভ্রমণকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যে সভার আয়োজন করে কাদম্বিনী তাতে সভাপতিত্ব করেন।

কাদম্বিনী ছিলেন প্রকৃত মানবতাবাদী। মালিকদের দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর শোষণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন তিনি এবং মনে করতেন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে অবিলম্বে এই শোষণের অবসান ঘটানো উচিত। আসামের চা বাগানে শ্রমিক নিয়োগের অব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর স্বামীর বিবৃতি তিনি সমর্থন করেন। ১৯২২ সালে সরকার কর্তৃক গঠিত এক তদন্ত কমিশনের পক্ষ থেকে তিনি কামিনী রায়ের সঙ্গে কয়লাখনির নারী শ্রমিকদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন। ঘনিষ্ঠ বান্ধবী স্বর্ণকুমারী দেবীর বহু কল্যাণমূলক কাজেও সহায়তা করেছিলেন।

বাইরের যে মহিলা এমনই প্রগতিশীল, সমাজের অনুশাসন তাদের মেনে চলতে হোত। হিন্দু মহিলারা লেডি ডাক্তারের সঙ্গে সবরকম সামাজিক সম্পর্ক বাঁচিয়ে চলতেন। সুপ্রসবের পরে কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো ডাক্তারকে খেতে হয়েছে দাসীদের খাবার দালানে, এঁটো পাতা নিজেকে ফেলতে হয়েছে কোন দাসী তা স্পর্শ করবে না বলে। সামাজিক নিমন্ত্রণে এসে লেডি ডাক্তারের ছোঁয়া বাঁচিয়ে খেতে বসেছেন মেয়েরা, তাঁর স্পর্শ করা খাদ্য গ্রহণ করার তো প্রশ্নেই উঠছে না। মজার ব্যাপার হলো সাধারণ নারীরা যখন ব্যাপারটা নিয়ে বেশ হৈ চৈ করতেন মহিলা চিকিৎসকেরা মোটেও গুরুত্ব দিতেন না। কাদম্বিনী

এসব গায়ে মাখতেন না কিংবা হেসে উড়িয়ে দিতেন।

কাদম্বিনীর চিকিৎসক জীবনের শুরুটা মোটেও বর্ণময় নয়। যে কোনো চিকিৎসকের জীবনে এই সময়টি কঠিন সময়। কাদম্বিনীকে অবশ্য ইডেন হাসপাতালে কাজ করবার অনুমতি দিয়েছিলেন ডাঃ কোট্‌স। যদিও সেখানে তাঁর মর্যাদা ছিল ধাত্রীর সমতুল্য। তিনি ৪৫/৫ নং বেনেটোলা লেনে চেম্বার খুলে বসেন। কিন্তু ডাক্তার হিসেবে প্রার্থিত কাজ তিনি পাচ্ছিলেন না। তাঁর ইচ্ছে ছিল একটি ওয়ার্ডের ভার নেওয়া কিন্তু ইংরেজ কর্তৃপক্ষ কোনো ভারতীয়কে সে মর্যাদা দিতে রাজি নয়। ১৮৯০ সালে কাদম্বিনী লেডি ডাফরিন হাসপাতালে মর্যাদাপূর্ণ চাকুরি পান উচ্চবেতনে। তিনশত টাকা মাসিক।

কাদম্বিনী ভালো ডাক্তার ছিলেন। কড়া কথা, অপ্রিয় সত্য বলতে দ্বিধা করতেন না। নিজের ছেলেমেয়েদেরও বাদ দিতেন না। পরবর্তীকালের স্বাধীনতা সংগ্রামী জ্যোর্তিময়ী দেবী তাঁর কন্যা ছিলেন। জ্যোর্তিময়ী যখন বেথুনে পড়তেন পোষাকে নিয়মভঙ্গ করে চৌখুপি ডুরে শাড়ি বড়ো গলা জামা পরলে বকুনি খেতেন। কাদম্বিনী নিজে শৌখিন ছিলেন কিন্তু অকারণে তথাকথিত আধুনিকতাকে বড় করে দেখতেন না।

কাদম্বিনীর মৃত্যুও মহান। তিনি জীবনের শেষ দিন অবধি কাজ করেন। শেষ দিকে রক্তচাপ বেড়ে যাওয়ায় রোগী দেখা অনেক কমিয়ে দেন। জীবনের শেষদিনে একটি অস্ত্রোপচার করেন। সেদিন ১৯২৩ সালের ৩রা অক্টোবর। শেষ রোগী দেখে পারিশ্রমিক পান পঞ্চাশ টাকা। সেই টাকাতেই তাঁর শেষকৃত্য হয়। মহীয়সী কাদম্বিনীর জীবনে এইভাবেই যবনিকা নেমে আসে।

নারী প্রসঙ্গে পেরিয়ার - আমার চোখে পেরিয়ার

প্রেরণা রায় সেনগুপ্ত

এই দেশটাতো আমার নয়ই, কারণ আমি জানি এই দেশ ব্রাহ্মণ্যবাদী উচ্চবর্ণের দেশ। এদেশে দলিত-সংখ্যালঘুর অবস্থান আশ্রিতের। আর আমি জন্মপরিচয়ে যাই হই না কেন, এখন আমি এ দেশের শ্রমজীবী জনগণ, দলিত সংখ্যালঘুর দলে। সে কারণেই " এ আর্যাবর্ত আমার দেশ নয়।" সে তো নয়ই, এই সমাজও আমার সমাজ নয়। কারণ আমি এক দিকে ব্রাহ্মণ্যবাদকে বিরোধিতা করছি, অন্যদিকে আমি নারী। এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে আমার অবস্থান 'শূদ্রসম'। অনেকেই হয়ত বলবেন এসব কথা অতীত হয়ে গেছে। কিন্তু আমি মানি, এবং জানি যে এ দেশ ও এ সমাজ আজও মতাদর্শভাবে 'মনুসংহিতা' পরিচালিত, যেখানে নারীকে শূদ্রের সমতুল্য বলা হয়। ফলে কোনো উচ্চ বর্ণের নারীও সারা জীবনে দলিতের মতোই শোষিত। জাতি-বর্ণ, লিঙ্গগত বিভাজনের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে এদেশের কায়েমি স্বার্থ শ্রেণী শোষণ।

যেখানে সবচেয়ে বেশি অন্ধকার থাকে, সেখান থেকেই আলো ফুটে ওঠে, যেখানে সবচেয়ে বেশি শোষণ -অত্যাচার, সেখান থেকেই প্রথম সংগ্রাম জ্বলে ওঠে। এটা বারবার দেখা গেছে বিশ্ব ইতিহাসে। সে কারণেই এ দেশে শোষিত-অবহেলিত অত্যাচারিত দলিত আন্দোলনকারীদের কাছ থেকেই উঠে আসে নারী স্বাধীনতার ম্যানিফেস্টো, দলিত আন্দোলনের নেতৃত্বই হয়ে ওঠেন ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রবক্তা। তাঁর নাম পেরিয়ার রামস্বামী। দ্রাবিড় কাজাগম এর প্রতিষ্ঠাতা। নাস্তিকতার ধারণা প্রচারক পেরিয়ারের পরিচয় দেওয়া বাতুলতা মাত্র।

দক্ষিণ ভারতে একদিকে তিনি ছিলেন দলিত মুক্তি আন্দোলনের আপোষহীন নেতা, অন্যদিকে আবার তিনিই ভারতের মাটিতে ভারতীয় অবস্থার সাপেক্ষে নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রথম তাত্ত্বিক। দলিত আন্দোলন পরিচালনা করতে করতেই তিনি বোধহয় ধরতে পারেন নারী আন্দোলনের সাথে তার আশু সম্পর্কটিকে। কারণ শাস্ত্র নির্দিষ্ট অনুশাসনেই দলিতের জন্ম, এবং সেই কারণেই নারীশোষণেরও বৈধতা পায় এই পুরুষের সমাজ। এই সত্যটি তার লেখনীর

মাধ্যমেই সামনে আসে প্রথম। আজ থেকে ৮০ বছর আগে লেখা তার প্রবন্ধগুলি আজও আমার কাছে যুগোপযোগী ও প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। কারণ সত্যি কথা বলতে, যে অবহেলা-অবমাননা নিজে সহ্য করেছি, তার উৎস ও ভিত্তি কোথায়, তত্ত্ব এবং তথ্য সহকারে জানতে পারি আজ তার লেখা প্রবন্ধগুলি পড়ে। একথাও এখানে বলা দরকার, যে হিন্দু বেদ-পুরাণ-মহাকাব্য যেভাবে নারীদের প্রতি অবমাননাকর বক্তব্যের মাধ্যমে নারী শোষণের ভিত তৈরি করেছে, তার সুস্পষ্ট উদাহরণও আমি পাই পেরিয়ারের সঙ্কলনে। তার সূত্র ধরেই আমি অন্ততঃ আরো ভালো করে দলিত আন্দোলনের অংশ হয়ে ওঠার দরকারটা অনুধাবন করি। যে ধর্মকে জন্ম থেকে গৌরবের সাথে ঘোষণা করে এসেছি, সেই ধর্মই যে আমাকে অবহেলা ও অবমাননার পাত্রী বানিয়েছে সেটা জানার পরই তীব্র হয় ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধিতা। একথা ভুল বলা হবে না, যে নির্মোহ ভাবে বাস্তবকে চিনিয়ে, মিথ্যা গৌরবের ফানুসকে চুপসে দিয়ে আমাকে সংগ্রামমুখী হওয়ার প্রয়োজনটাও বুঝিয়েছে পেরিয়ারের নারী স্বাধীনতা বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলনটি। গলায় মঙ্গলসূত্র মাথায় সিঁদুর, হাতে শাখা, নোয়া, পলা, লোহা পরে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেন অনেক নারী। নিজেকে মনে মনে 'পতিব্রতা', 'সতীত্ব অটুট' বলেও আনন্দ পান অনেকে। এ গৌরব নয়, বরং অপমান, এ বোধকে তথ্যসহকারে মনে গেঁথে দিতে সাহায্য করেছে ঐ প্রবন্ধগুলি। আজ আমি সজোরে বলতে পারি — পেরিয়ারের লেখার মতোই 'সতীত্ব শুধু নারীর কেন থাকবে?', ' স্বামী মানে প্রভু, পতিব্রতা মানে দাসী ছাড়া আর কিছু নয় কেন?'

পেরিয়ারের নারীমুক্তি বিষয়ক প্রস্তাবগুলি এখনও প্রাসঙ্গিক। তিনি নারী স্বাধীনতার জন্য প্রথাগত বিয়ে বাতিল করে যৌথ জীবনের পক্ষে ছিলেন, তিনি জন্মনিয়ন্ত্রণের কথা প্রচার করেন, সন্তানধারণের ক্ষেত্রে নারীর সিদ্ধান্তকেই প্রধান বলে ঘোষণা করেন, বিধবাবিবাহের পক্ষেও তিনি প্রচার করেন, এমনকি চাকরিতে ৫০ শতাংশ সংরক্ষণও তিনি দাবি করেন নারীদের জন্য। সেটাকে হয়তো উৎপাদনের সাথে যুক্ত হবার মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন হিসেবেও দেখানো যায়।

জাতি বর্ণভেদ ও গণতন্ত্র ঃ একটি সম্পর্কের সন্ধানে

কণিষ্ক চৌধুরী

" ... ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা অনুসারে বাস্তব জীবনের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনই হচ্ছে ইতিহাসে শেষ পর্যন্ত নির্ধারক বস্তু। এর বেশী কিছু মার্কস বা আমি কখনো বলিনি। অতএব, কেউ যদি তাকে বিকৃত করে এই দাঁড় করায় যে, অর্থনৈতিক ব্যাপারই হচ্ছে একমাত্র নির্ধারক বস্তু, তাহলে সে প্রতিপাদ্যটিকে একটি অর্থহীন , অমূর্ত নির্বোধ উক্তিতে পরিণত করে।"

- ই.ব্লককে লেখা এঙ্গেলসের চিঠি , লন্ডন ২১-২২ সেপ্টেম্বর, ১৮৯০

ভারতীয় সমাজের বহুবিধ অসাম্যের অন্যতম হল জাতি-বর্ণ ব্যবস্থা। প্রাচীন কাল থেকে একটি জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ব্যবস্থাটির বিকাশ ঘটেছে। ব্রিটিশ শাসনের সম আইন ব্যবস্থা, শিক্ষা রেলপথ, টেলিগ্রাফ, সংবাদপত্র এই জাতি-বর্ণ ব্যবস্থাকে আঘাত করলেও - পরিবর্তন এসেছিল কেবল বহিরাঙ্গে, মূল কাঠামোটি থেকে গেলো অপরিবর্তিত। ১৯৫০ সালের ভারতীয় সংবিধানে জাতি -ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিককে সমানাধিকার দান করা হলেও - জাতি বর্ণগত শোষণ-পীড়নের অবসান ঘটেনি। বরং সুতীব্রভাবে অনুভূত হয়েছে বারংবার। সাংস্কৃতায়িত (ব্রাহ্মণ্যবাদ' শব্দটির থেকে অধিকতর উপযোগি বলে মনে হয়) চিন্তা চেপে বসেছে গোটা সমাজের মাথার উপর, যা আবার আধা সামন্ততন্ত্রের মতাদর্শের অংশ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। স্বভাবতই গণতন্ত্র ও জাতি বর্ণ ব্যবস্থার বিচিত্র সহাবস্থানের প্রশ্নটি ভারতীয় সমাজ ও সমস্যা সম্পর্কিত আলোচনায় গুরুত্বের দাবি রাখে।

ধ্রুপদী ধারণা অনুযায়ী গণতন্ত্র হল সাম্য, স্বাধীনতা আর ন্যায় বিচার। জাতি-বর্ণ হল অসাম্য ও অস্বাধীনতার চরমতম রূপ, যা আবার ন্যায় বিচারকে অসম্ভব করে তোলে। সুতরাং, জাতি বর্ণ ভেদ থাকলে গণতন্ত্র থাকতে পারে না। আবার গণতন্ত্র থাকলে জাতি-বর্ণভেদ অসম্ভব হয়ে পরে। তাহলে? নাকি এ রকম কোন দ্বিবিভাজন নেই যেখানে ধর্মের অংশ হিসেবে জাতি বর্ণ ভেদ ও রাজনীতির

অংশ হিসেবে গণতন্ত্র উন্নয়ন ও মুখোমুখী যুদ্ধে অবতীর্ণ? কী ভাবেই বা সমস্যাটির চর্চা করবো - পরম্পরা ও আধুনিকতার মধ্যেকার সংঘাত হিসেবে? কিছু পুরানো কথা দিয়ে শুরু করে বর্তমানে প্রবেশ করা যাক।

পুরানো কথা

আর্য আগমনের বহু পূর্বেই ভারতবাসী গড়ে তুলেছিল তাদের নিজস্ব সভ্যতা মেহেরগড় ও সিন্ধু সভ্যতা। এই দুই সভ্যতাতে বর্ণ বিভাজন না থাকলেও আবির্ভাব ঘটেছিল শ্রেণী বৈষম্যের। বেদ রচয়িতা আর্য আক্রমণেই ধ্বংস হয়ে যায় এই অনার্য সিন্ধু সভ্যতা। (চট্টোপাধ্যায়, ২০০৩:৫২)। আর্যদের ভারতে প্রবেশের সময় (১৭৫০ খ্রি: পূর্বাব্দে) ও পাঞ্জাবে স্থায়ীভাবে বসবাস কালেও তাদের মধ্যে জাতি-বর্ণভেদ ছিল অনুপস্থিত। কিন্তু যখনই অস্ত্রের জোরে গৌরবর্ণের উন্নত নাসা ও প্রশস্ত ললাটের অধিকারী আর্যগণের দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ ভারতীয় (অনার্য) দের পরাজয় ঘটলো তখনই গাত্রবর্ণের ভিত্তিতে সমাজে নতুন বিভাজন তৈরি হলো। আবির্ভাব ঘটলো বর্ণভেদের। কিন্তু তখনও পর্যন্ত আর্য সমাজ আদিম সাম্যবাদী সমাজের ধারাবাহিকতা থেকে মুক্ত হয়নি। অর্থাৎ শ্রেণীগত বিভাজন তখনও গঠিত হয়নি। কিন্তু ইতিমধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে বর্ণবিভাজনের। এর সাথে যুক্ত হল আচারগত (ritual) পার্থক্য। অনার্য ভারতীয়দের আচার আচরণ ছিল আর্যদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তাই তাদের ' অনাব্রত' বা ' অব্রত' বলা হত। আর্যরা নিজেদের দ্বিজ বলে ঘোষণা করলো। যার মধ্য দিয়ে তারা মর্যালাগত দিক উচ্চতর - এই দাবিকে সামনে নিয়ে এল। আর্য-অনার্যদের মধ্যেকার ভেদের অন্যতম প্রধান ভিত্তিই ছিল শাসক- শাসিতের মধ্যেকার বিভাজন, (Panikkar, K.M. 2007:5))। অন্যভাষায় রাজনৈতিক পদমর্যাদা বা রাজনৈতিক ক্ষমতাগত দূরত্ব। এটিও তখন কোনো স্পষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়নি। আর্যদের মধ্যেকার অস্পষ্ট বিভাজন (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) এবং অনার্য শূদ্রদের মধ্যে বৃত্তিভিত্তিক কঠোরতা ও বর্ণকেন্দ্রীক বিবাহের আবির্ভাব ঘটেনি। (Habib, I. 2010: xix) । অন্য ভাষায়, জন্ম দ্বারা বর্ণপরিচয় বা সামাজিক রাজনৈতিক পদমর্যাদা নির্ধারিত হত না, হত পেশার দ্বারা । আদি

ঋকের কোথাও পেশা নির্বাচনের সাথে বংশানুক্রমিকতাকে সংযুক্ত করা হয়নি। (পূর্বোক্ত)। বরং দেখা যায় যে, কোনো আর্যের স্ত্রীকে শূদ্র অপহরণ করলে যে শাস্তি প্রদানের কথা বলা আছে, ঠিক একই শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে আর্য কর্তৃক শূদ্রের স্ত্রী অপহরণের ক্ষেত্রেও। (বাজসেনীয় সংহিতা, পূর্বোক্ত)। এই পর্বে লুই ডুমো (২০০৯) কর্তৃক উল্লেখিত পবিত্রতা - অপবিত্রতা ধারণাটিও ছিল খুবই দূর্বল। এর পিছনে সুস্পষ্ট দুটি কারণ ছিল ঃ ১) নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থা তখন গড়ে ওঠার মুখে থাকলেও আদিম সাম্যবাদী সমাজ তখনও পুরোপুরি অপসৃত হয়নি, বিশেষ করে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এবং ২) উৎপাদন ব্যবস্থাটিতে তখন দাস-শ্রম ভিত্তিক উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ প্রক্রিয়া শুরু হলেও, সমাজ শ্রেণী বিভাজন পূর্ণরূপে বিকশিত হয়নি। তখনও উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল মূলত: সাম্যতান্ত্রিক যূথবদ্ধতা ভিত্তিক।

" আর্যদের জীবনযাত্রার ধরন ছিল গোষ্ঠীগত। তারা ঠিক স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন না। তাদের জীবনযাপনের ভিত্তি ছিল গো পালন।" (শর্মা, রামশরণ, ১৯৯৯:১১)। সম্পদশালী অনার্যরা ছিল আর্যদের কাছে ঈর্ষার পাত্র। আর্যরা এই সম্পদশালী অনার্যদেরকেই দস্যু হিসেবে চিহ্নিত করতো। তারা বর্ণিত হতো ' অব্রত', 'অন্যব্রত' বা 'অপব্রত' হিসেবে। কারণ এই জনগোষ্ঠীগুলির রীতিনীতি বা বিধি ছিল আর্যদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। (পূর্বোক্ত:১২)। এই প্রসঙ্গে দাসদের কথাও উল্লেখ্য। দাসগণ সংগঠিত ছিলেন ' বিশ' নামের জনগোষ্ঠীতে। এই দাস ও দস্যুদের অসংখ্য দুর্গ আর পাঁচিল ঘেরা বসতি ছিল। আর্যরা যুদ্ধের সময় এগুলিকে ভেঙে দিত। (পূর্বোক্ত:১০) এই কারণে ঋগ্বেদে ' ইন্দ্রকে' পুরন্দর ব দুর্গ ধ্বংসকারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর্যদের কেবল কৃষ্ণবর্ণের ' অনাস' (খর্বনাসা) অন্যব্রতদের সাথে লড়াই করতে হয়নি। তাদের লড়াই করতে হয়েছে বৈরী আর্যদের সাথেও। গবাদি পশু ও অন্যান্য ধরনের ধনসম্পদের অধিকার নিয়েই এই আর্য - আর্য এবং আর্য-দাস ও দস্যুদের সংঘাত। যেমন ঋগ্বেদীয় আর্যদের দুটি প্রধান শাখা পুরু ও ভারতের মধ্যে সংঘাত। আর্য জনগোষ্ঠীর নিজেদের মধ্যে লড়াই-এ দাসরা ছিল স্বাভাবিক মিত্র। (পূর্বোক্ত:১৬)। পরাজিত দাস ও আর্যদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা

হতো। এবং পরিণামে তাদের নামিয়ে আনা হতো দুঃস্থ অনার্য পর্যায়ে।(পূর্বোক্ত:১৭)।

ঋগ্বেদে বর্ণ শব্দটি কোনো শ্রম বিভাজনের ইঙ্গিত দেয় না। ঋগ্বেদেই রয়েছে, ইন্দ্র দাসদের আর্যে পরিণত করেছেন। আবার অন্য এক স্থানে রয়েছে, ইন্দ্র দস্যুদের 'আর্য' নাম কেড়ে নিয়েছেন। আর্য সমাজের চতুর্থ বর্ণ শূদ্রের উল্লেখ পুরুষসূক্ত ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। অধ্যাপক শর্মা মনে করেন যে, শূদ্ররা হল খ্রি:পূর্ব ২০০০-এর পর উত্তর পশ্চিম ভারতে আগত একটি বিদেশী জনগোষ্ঠী। এরা বৈদিক আর্যদের দ্বারা পরাজিত হন এবং বৈদিক সমাজে চতুর্থ বর্ণ হিসেবে স্থান পান। (১৯৯৯:৩৭) সময়ের সাথে সাথে এই চতুর্থ বর্ণ শূদ্রের মধ্যে পরাজিত দস্যু, দাস সহ বিজিত আর্যদের অন্তর্ভুক্তি ঘটে। ব্যক্তিগত সম্পদ ও শ্রম বিভাজনের আবির্ভাব, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় সংঘাতে ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা, জন্ম দ্বারা বর্ণনির্ধারণ বর্ণ ব্যবস্থাকে যেমন স্থায়ী ও দৃঢ় করলো, তেমনি জাতিভেদ সৃষ্টির উপাদানগুলিরও জন্ম দিল। বর্তমান কালে তা জাতি-বর্ণভেদের রূপ ধারণ করেছে। অর্থাৎ বর্তমানের জাতি-বর্ণভেদ হল সুদীর্ঘকালের inclusion ও exclusion এর ফল, যা এখনও চলছে। এই অর্থে জাতি-বর্ণভেদ মূলক ব্যবস্থাতেও একধরণের সচলতা থাকে। এই সচলতার প্রক্রিয়াটি আবার আবদ্ধ (closed) সমাজের ধারণাকে বাতিল করে দেয়, যদিও এটা সত্য যে, এই সচলতা জাতি-বর্ণভেদের মৌলিক কাঠামোর কোন র‍্যাডিকাল পরিবর্তন ঘটায় না।

মেলাবেন তিনি

এটা ভাবা হয়েছিল, বিশেষ করে ইউরোপীয় মডেলের যান্ত্রিক অনুকরণে যারা আস্থাশীল, তারা অন্ততঃ একটি সহজ সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, পাশ্চত্যকরণ (আধুনিকায়ন), সেকুলারাইজেশন (ধর্মনিরপেক্ষকরণ নয়) ইত্যাদি প্রক্রিয়া একদিনে যেমন গণতান্ত্রিক পরিবেশ বা সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্যে করবে, তেমনি পরম্পরাক্রমে জাত প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাভাবিক অপসারণ ঘটাবে।

বর্তমান ভারতীয় সমাজে রাজনীতি, অর্থনীতি সংস্কৃতি সকল ক্ষেত্রেই জাতি-বর্ণভেদের তীব্রতা যথেষ্ট পরিমাণে অনুভূত। এখন প্রশ্ন হল কীভাবে এই প্রতিষ্ঠানটি সুদীর্ঘকাল ধরে টিকে আছে? আইনসভা, আইনের সাম্য, স্বাধীন বিচার বিভাগ, নির্বাচিত সংসদ, স্বাধীন গণমাধ্যম, উন্মুক্ত নির্বাচন, রাজনৈতিক অধিকার, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার, বহুদল ব্যবস্থা, বিরোধী দলের অবস্থান - এ সবই ভারতে সত্য। কিন্তু শেষ সত্য নয়। কারণ এসবের সাথেই রয়েছে জাতি-বর্ণভেদ ব্যবস্থা। তাই অনুসন্ধান চালাতে হয় প্রশ্নটির উত্তর খোঁজার। আর তা করতে গিয়ে চর্চা করতে হয় কেবল উৎপাদন ব্যবস্থাটিই নয়, চর্চা করতে হয় শিক্ষা ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ক্ষমতা, ধর্মীয় সংগঠন ও সংস্কৃতিকেও। ভারতীয় সমাজের অসম বিকাশ অসংখ্য জাতি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়ের উপস্থিতি, উৎপাদিকা শক্তির ক্রমবিকাশ, সংস্কৃতায়ন, হিন্দুধর্মের বহুত্ববাদী ব্যবস্থা ইত্যাদি সামগ্রিকভাবে জাতি-বর্ণভেদকে টিকিয়ে রেখেছে। বিষয়টি বিস্তৃত আলোচনার দাবি রাখে। বর্তমান অংশটি সীমাবদ্ধ থাকবে গণতন্ত্রের সাথে জাতি-বর্ণের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে।

জাতি-বর্ণভেদ একটি ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যস্ত ব্যবস্থা। এখানে প্রতিটি জাতি-বর্ণের মধ্যে সামাজিক পরিচয়গত সমমাত্রিকতা থাকায় এটা একটা পর্যায় পর্যন্ত গণতন্ত্রকে প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু প্রতিটি জাতি-বর্ণের মধ্যে আবার শ্রেণী বিভাজন ও আছে। অর্থাৎ সম্পত্তিবান ও সম্পত্তিহীন শ্রেণীর অস্তিত্বও থাকে। যাদের মধ্যে শ্রেণী বিরোধ একটি স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু জাতি - বর্ণভিত্তিক মতাদর্শ এই শ্রেণী বিরোধকে লঘু করে দেয়। এবং একই জাতিবর্ণের মধ্যেকার দুই বিপরীত শ্রেণীর সমন্বয় ঘটায়, সম্পত্তিবান উচ্চজাতি বর্ণের সাথে সম্পত্তিহীন উচ্চ ও নিম্নজাতি বর্ণের সংঘাত প্রশমিত হয় কেবল ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক মতাদর্শের জন্যেই নয়, নিম্নবর্গীয় কমনসেন্সের কারণেও।

উচ্চ ও নিম্ন জাতি-বর্ণগুলির পৃথক বলয় গঠন উত্তরোত্তর শক্তিশালী হয়ে পড়ছে। কিন্তু একই সাথে তা ভাঙছে। ভাঙার কারণগুলি যথা সময়ে আলোচনা করা হবে। এখানে লক্ষ করার বিষয় হল জাতি-বর্ণভিত্তিক ক্রমোচ্চ স্তর

বিন্যাসের উপরের দিকে অবস্থিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতি-বর্ণগত গণতন্ত্র যে -অনুপাতে কম, সেই অনুপাতে নিম্ন জাতি-বর্ণের মধ্যে বেশি। কারণ পাশ্চাত্যকরণ, সেকুলারকরণের এক ধরনের প্রভাব উচ্চ জাতি-বর্ণের মধ্যে প্রবল। ফলাফলে তাদের মধ্যেকার সংহতি হ্রাস পাচ্ছে। বিপরীতে নিম্ন জাতি-বর্ণের মধ্যে সংহতি বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে। যেমন ধরা যাক ব্রাহ্মণ্যবাদ বা ক্ষত্রিয়ত্বের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গড়ে না উঠলেও নিম্ন জাতি-বর্ণের বহু রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ঘটেছে।

নিম্ন জাতি-বর্ণের অধিকাংশ আবার নিম্নবর্গও বটে। ফলে তারা দুই ধরণের শোষণ ও অত্যাচারের মুখোমুখি হচ্ছে - প্রথমত, নিম্ন জাতি-বর্ণ হিসেবে এবং দ্বিতীয়ত নিম্ন বর্গ হিসেবে। নিম্ন জাতি-বর্ণের মধ্যে যে ইনফ্রুপ সেন্টিমেন্ট থাকে, তাকে কাজে লাগায় তাদের মধ্যেকার ক্ষুদ্র উচ্চবর্গ। তারা যত না শ্রেণীগত শোষণ ও অত্যাচারের কথা বলে, তার থেকেও বহুগুণ জাতি-বর্ণগত অত্যাচার, শোষণ ও অসাম্যের কথা বলে। কখনো বা শ্রেণীগত শোষণ ও অত্যাচারকেও জাতি-বর্ণগত অত্যাচার হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করে। ফলে শ্রেণী বিরোধ আড়ালে চলে যায় বা তাকে গ্রাস করে ফেলে জাতি-বর্ণভিত্তিক প্রশ্নগুলি। সামনে চলে আসে বর্ণগত ঐক্য যাকে কাজে লাগিয়ে বা আনুভূমিক সংহতিকে কাজে লাগিয়ে ঐ জাতি-বর্ণের মধ্যে উল্লম্ব সংঘবদ্ধতাকে তৈরি করে। ফলে জাতি-বর্ণের মধ্যেকার উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের শ্রেণী বিরোধ প্রশমিত হয়। এটাই জাতি-বর্ণ ভিত্তিক রাজনীতির সারবস্তু।

ভারতবর্ষে জাতি-বর্ণ ব্যবস্থাই সামাজিক আবদ্ধতার অন্যতম উপাদান। এই আবদ্ধতা যে নিপীড়নের জন্ম দেয় তার বিরুদ্ধে যুগে যুগে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। এই প্রতিবাদী আন্দোলনের মধ্যদিয়ে জন্ম নিয়েছে নতুন নতুন সম্প্রদায় ও কাল্ট(সাধন পদ্ধতি)। এই সম্প্রদায় ও কাল্টগুলি জাতি-বর্ণের অসমতাকে অস্বীকার করেছে। এক ধরনের উদারতাবাদ ও গণতন্ত্রকে আহ্বান করেছে। যদিও এ গণতন্ত্র ও উদারতা আধ্যাত্মিকতার জারক রসে জারিত। তবুও জাতি-বর্ণগত নিপীড়ন থেকে, অসাম্য থেকে ব্যক্তি কিছুটা হলেও মুক্তি পায়।

কিন্তু জাতি-বর্ণের ভিত্তি হিসেবে যে অর্থনৈতিক ও বৌদ্ধিক কাঠামো ছিল তা অপরিবর্তিতই থেকে গেলো। এবার সময়ের সাথে সাথে এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যেই জাতি-বর্ণভেদের আর্বিভাব ঘটলো বা এগুলি জাতি-বর্ণকেন্দ্রিক হয়ে পড়লো। লক্ষ করার বিষয় হলো, ইউরোপে যেখানে চার্চের সাথে রাষ্ট্র ও গণতন্ত্রের বিরোধ বেঁধেছে প্রতিক্ষণে, সেখানে ভারতবর্ষে রাষ্ট্র কখনই ভারতীয় চার্চ জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার সাথে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েনি। বরং রাষ্ট্রের সাথেই ধর্ম-বর্ণ জড়িয়ে থেকেছে। ফলে জাতি -বর্ণ সংরক্ষণে রাষ্ট্রের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যব্যঞ্জক। এ ক্ষেত্রে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে খুব বেশি ফারাক নেই।

ব্রিটিশ যুগে পাশ্চাত্যকরণ প্রক্রিয়া জাতি-বর্ণের উপরিস্তরে কিছু পরিবর্তন আনতে সক্ষম হলেও, মূল কাঠামোটি অচঞ্চলই থেকে গেছে। শুধু তাই নয় সাবেক সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলি এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীনিবাসের পর্যবেক্ষণটি হল - পাশ্চাত্যকরণ প্রক্রিয়া পুনরুত্থানবাদ, সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও জাতি-বর্ণভেদ বাদ-এর জন্ম দিয়েছে, পাশ্চাত্যের অনুকরণে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বই, পত্রিকা, প্রচারপত্র ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এই ভাবনাগুলিকে ছড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাটিও এখানে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। (২০০১:৫৮)। বস্তুতপক্ষে পাশ্চাত্যকরণের এই অভিমুখ ছিল না যে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির মৌল কাঠামোটিকে আঘাত করা। ফলে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সাথে বোঝাপড়ার মাধ্যমে এ দেশ লুণ্ঠনের কাজটি তারা সুচারুরূপেই সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে অন্ধকারের শক্তিগুলি দুর্বল তো হয়নি, বরং আরও শক্তিশালী হয়েছে। ফলে আইনের শাসন, অস্পৃশ্যতার অবসান ইত্যাদি আসলে শূন্যগর্ভে পরিণত হয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক যেমন ক্ষুণ্ন হয় নি তেমনি তারই সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে জাতি-বর্ণভেদ ব্যবস্থাও থেকে গেছে। পাশ্চাত্যকরণ মানস জগতে তাকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে।

গণতন্ত্রের সাফল্যের অন্যতম শর্ত হল সেকুলার ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা। এমনটাই উদারতাবাদীরা মনে করেন। এ হেন ব্যবস্থায় জাতি-বর্ণের

সাথে রাজনৈতিক দলগুলির দেওয়া নেওয়ার সম্পর্কটা কেমন? সেকুলার ও গণতান্ত্রিক পার্টিগুলি জাতি-বর্ণকে কোন চোখে দেখে? পার্টি কর্মসূচীতে তত্ত্বগত ভাবে যাই বলা হোক না কেন, বাস্তবে ভোটের রাজনীতির তাগিদে তারা এই জাতি বর্ণভেদ ও ধর্মীয় অনুভূতিকে যে ব্যবহার করে থাকে, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। এখানে তিন ধরনের সংগঠনের মধ্যেকার আন্তসম্পর্কটি উল্লেখ্য - ১) জাতি - বর্ণভিত্তিক রাজনৈতিক দল। এদের আদর্শই হল নির্দিষ্ট জাতিবর্ণের স্বার্থকে রক্ষা করা, অর্থাৎ বহিরঙ্গে এরা আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে যুক্ত থাকলেও, অন্তর্বস্তুর দিক থেকে এরা জাতি-বর্ণভিত্তিকেই শক্তিশালী করে তোলে। ২) জাতি-বর্ণভিত্তিক সামাজিক সংগঠন। এরা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় সংগঠনগতভাবে প্রত্যক্ষ অংশ নেয় না। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলির সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দর কষাকষি চালায়। অর্থাৎ এক ধরনের চাপ-গোষ্ঠীর ভূমিকা পালন করে। ৩) উদারপন্থী, জাতীয়তাবাদী ও সেকুলার রাজনৈতিক দলগুলি একদিকে জাতি-বর্ণ ও ধর্মভিত্তিক দলগুলির সাথে নির্বাচনী জোট গঠন করে, আবার অন্যদিকে জাতি -বর্ণভিত্তিক সামাজিক সংগঠনগুলির মধ্যে নিজেদের প্রভাবের এলাকাকে বৃদ্ধি করার চেষ্টা চালায়। লক্ষ, নির্বাচনে সমর্থন লাভ। এরই পাশাপাশি জাতি-বর্ণভিত্তিক রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠনগুলি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলির সাথে দরকষাকষি করে - বিশেষ করে নির্বাচনকে সামনে রেখে। নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা যখন আধুনিক গণতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে কাজ করে, তখন তারাই আবার জাতি-বর্ণ ব্যবস্থাকে বৈধতা দেয় ও শক্তিশালী করে তোলে।

পরিণতিতে গণতন্ত্রের আদর্শ ও মূল্যবোধ মূল্যহীন হয়ে পড়ে। সাম্যের আদর্শ পদদলিত হয় জাতি-বর্ণগত মতাদর্শের কাছে। জাতি-বর্ণের মধ্যেকার উচ্চবর্গের স্বার্থই হয়ে পড়ে জাতি-বর্ণের স্বার্থের সমরূপ। ফলে নিম্নবর্ণের নিম্নবর্গের জীবনে কোনো পরিবর্তন হয় না। তাদের প্রান্তচেতনা কোনো প্রতিস্পর্ধী নির্মাণে সক্ষম হয় না। সামন্ততন্ত্রের অন্ধকার শক্তিগুলি লালিত পালিত হয় শহুরে গণতন্ত্রের আলো ঝলমল মিনারের আড়ালেই।

সূত্র নির্দেশিকা :

১. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, ২০০৩, *ভারতীয় দর্শন* , প্রথম খন্ড, এন.বি.এ: কলকাতা।

২. Panikkar, K.M. 2007, *Caste and Democracy*, Critical quest: New Delhi.

৩. Habīb, I. 2010, *Religion in India* (edited by Habib), Tulika Books: New Delhi.

৪. শর্মা, রামশরণ, ১৯৯৯, *প্রাচীন ভারতে শূদ্র*, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী: কলকাতা।

৫. চ্যাটার্জী, পার্থ, ১৯৯৮, 'জাতি ও নিম্নবর্গের চেতনা,' শেখর বন্দোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত সম্পাদিত *জাতি , বর্ণ ও বাঙালি সমাজ*, ১৯৯৮, CBS নতুন দিল্লী।

৬. Srinivas, M.N. 2001. *Social Change in Modern India*. Orient Longman Limited. : New Delhi.

৭. Dumont, L. 2009. *Homo Hierarchicus*. Oxford : New Delhi.

নতুনভাবে পুরনো পথে মতুয়াধর্ম

সুকৃতিরঞ্জন বিশ্বাস

হরিচাঁদ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন ১৮১২ খৃষ্টাব্দে বা ১২১৮ বঙ্গাব্দে। তাঁর বাবার নাম ছিল যশোবন্ত বিশ্বাস। পরবর্তীতে মানুষ তাদের ঠাকুর বলে জানতেন ও ডাকতেন এবং তারা ঠাকুর পরিবার হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের জীবনকাল খুব দীর্ঘ হয় নি। ৬৬ বছর বয়সে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১২৮৪ বঙ্গাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মতুয়া ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হরিচাঁদ ঠাকুর। যদিও তাঁর মতবাদ পূর্ণতা লাভ করে দু'টি মানুষের জীবনকাল ব্যাপী ভাবনা-চিন্তা ও লড়াই-সংগ্রামের মাধ্যমে। দ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন তাঁরই সুযোগ্য পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর। গুরুচাঁদ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন ১৮৪৬ সালে এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৯৩৭ সালে। অর্থাৎ ১৮১২ সাল থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যবর্তী ১০০ বছর বা তার সামান্য বেশি সময়কাল জুড়ে হরিচাঁদ ঠাকুর, গুরুচাঁদ ঠাকুর ও তাঁদের অনুগামী অনুসারিবৃন্দ এবং ডাঃ সি.এস. মিডের পরামর্শ ও চেষ্টায় আলোচ্য এই মতাদর্শ ও কর্ম মহাযজ্ঞ সম্পন্ন হয়।

হরিচাঁদ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন তথাকথিত চণ্ডাল পরিবারে। বাংলার সুবৃহৎ চণ্ডাল সমাজ অস্পৃশ্য, ঘৃণিত। তাদের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার নেই, লোকালয়ে যত্রতত্র ঘোরাফেরার অধিকার নেই, শিক্ষার অধিকার নেই। আজ অবধি কোন তথ্য মেলেনি, যাতে জানা যায়, হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মের পূর্বে কোন চন্ডাল অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন। হরিচাঁদ ঠাকুর নিজেও ছিলেন নিরক্ষর।

হরি - গুরু চাঁদের চিন্তা-চেতনা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে মতুয়াধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয় তার আকর গ্রন্থ শ্রীশ্রী হরি লীলামৃত এবং শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ চরিত। লীলামৃত গ্রন্থখানি হরিচাঁদ ঠাকুরের ও তাঁর সহকর্মীদের চিন্তা-চেতনা কর্মযজ্ঞের কাহিনী এবং শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ চরিতে বর্ণনা করা হয়েছে গুরুচাঁদের চিন্তা চেতনা, কাজ ও লড়াই-সংগ্রামের ইতিহাস। তার সহকর্মী, অনুগামী এবং সমকালীন

সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ইতিহাসও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। লীলামৃত গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ সম্ভব হয় ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে এবং গুরুচাঁদ চরিত প্রকাশিত হয় ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে।

যতদূর জানা যায়, হরিচাঁদ ঠাকুর ছিলেন বিদ্রোহী মানুষ। তাঁর বিদ্রোহের প্রকাশ ঘটে তাঁর শৈশব-কৈশোরকাল থেকেই। হরিচাঁদের পিতৃপুরুষেরা ছিলেন বৈষ্ণব মতাবলম্বী। ফলে ঐ বাড়িতে সচরাচর বৈষ্ণব বা বৈরাগীরা আসতেন, খেতেন এবং থাকতেন। তাঁদের আচার, আচরণ শুচি অশুচি বিকারগ্রস্ততা, শ্রম বিমুখতা বালক হরিচাঁদের অপছন্দ ছিল এবং তিনি তাঁদের একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। এ সম্পর্কে লীলামৃত গ্রন্থে লেখা হয়েছে -

" পদরজঃ দূরে থাক দন্ডবৎ নাই।
প্রহার পীড়ন কর যথাপূর্ব তাই।।
পিতৃকোলে থাকি হরি ক্রোধ করি বলে।
ভণ্ড বেটা বৈরাগীরা দূরে যাও চলে।।"

হরিচাঁদ ঠাকুর সম্পন্ন প্রজাকৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান পূর্ববাংলার ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার সফলাডাঙ্গা গ্রাম। জমিদারের সাথে গণ্ডগোলের জেরে জমিদার মিথ্যা দেনার দায়ে তাদের গ্রাম থেকে উৎখাত করেন। হরিচাঁদ ঠাকুরেরা পাঁচ ভাই মিলে জমিদারের অত্যাচারী নায়েব গোমস্তা পেয়াদা পাইকদের ধরে পেটানোর ঘটনা নিয়ে এই শত্রুতার শুরু। এ গ্রাম সে গ্রামে কিছুদিন কাটানোর পর তারা ওড়াকান্দি গ্রামে স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেন। উচ্চ বর্ণহিন্দু জমিদারের কুৎসিত গালি, অন্যায় অত্যাচার, মিথ্যা মামলা এবং তাঁদের ভিটে থেকে উৎখাতের ঘটনা হরিচাঁদ ঠাকুরের মধ্যে বর্ণঘৃণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বেলে দিয়েছিল, একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।

হরিচাঁদ ঠাকুরের সমকালীন সমাজে পূর্ববাংলার গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসা সেবার তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না। যৎসামান্য যা ছিল, তার সুযোগ নেওয়া অস্পৃশ্যদের

পক্ষে ছিল প্রায় অসম্ভব। কি উপায়ে তার নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য জানা না গেলেও, একথা ঠিক যে, হরিচাঁদ ঠাকুর চিকিৎসা বিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। লীলামৃত গ্রন্থে উল্লিখিত বহু ঘটনায় হরিচাঁদের এই পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল রোগীকে মৃত্যুভয় কাটিয়ে তোলা।

মূলতঃ চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শিতা হেতু হরিচাঁদ ঠাকুর সাধারণ মানুষের চোখে অসাধারণ বা দৈবশক্তিতে বলীয়ান বলে মনে হতে থাকে। এবং মানুষ তাঁর কাছে আসতে থাকেন। তাঁকে মান্য করতে এবং শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে শুরু করেন। এভাবে তিনি একদল অনুগত, বিশ্বস্ত ও যোগ্য সহযোদ্ধা ও কর্মীবাহিনী পান, যাঁদের সহযোগিতায় তিনি তাঁর ভাবনা, চিন্তা ও চেতনালব্ধ জ্ঞান মানুষ ও সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে থাকেন।

যেহেতু তিনি নিজে নিরক্ষর ছিলেন এবং নিরক্ষর অস্পৃশ্য সমাজে জন্মগ্রহণ করেন তাই এ যাবৎ মানব সমাজ ও সভ্যতার সঞ্চিত জ্ঞানের প্রায় কোন সহযোগিতা তিনি পান নি। তবে পুরুষানুক্রমে বয়ে চলা ঐতিহ্যমন্ডিত প্রাচীন নমোজাতির শ্রুতিজ্ঞানের অধিকারী যে তিনি হয়েছিলেন, একথা বুঝতে কষ্ট হয় না। পিতা, পিতামহ ও অন্যান্য প্রাচীন জনের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে সমাজে প্রবাহিত জ্ঞানের যে আভাসটুকু তিনি পেয়েছিলেন, নিজের অসাধারণ মনীষা, তীক্ষ্ণ জ্ঞান-বুদ্ধির জারক রসে জারিত করে সেই জ্ঞানকে তিনি সমৃদ্ধ করেন ও প্রয়োগে নিয়ে যান। এভাবে একটু একটু করে মতুয়া মতাদর্শ গড়ে ওঠে।

তিনি আবিষ্কার করেন যে, মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য মানুষের মর্যাদার জন্য, মানুষকে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন হয়ে মাথা উঁচু করে ও মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়াবার জন্য সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হলো অস্পৃশ্যতা প্রথা, যে অস্পৃশ্যতা ধর্মীয় বিধানসিদ্ধ ব্যবস্থাপত্র।

হরিচাঁদ ডাক দিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুধর্মকে অস্বীকার করার জন্য। হিন্দুধর্মীয় শাস্ত্রনীতি, নীতিকথা এবং এসবের স্রষ্টা ও পালক ব্রাহ্মণদের বর্জন করার আহ্বান

জানালেন। লীলামৃত গ্রন্থের ভাষায় সেকথা লেখা হলো এভাবে -

" ব্রাহ্মণ রচিত যত অভিনব গ্রন্থ।
ব্রাহ্মণ প্রধান মার্কা বিজ্ঞাপন যন্ত্র।।

.....

কোথায় ব্রাহ্মণ দেখ কোথায় বৈষ্ণব।
স্বার্থ বশে অর্থলোভী যত ভন্ড সব।।

.....

কুকুরের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পেলে খাই।
বেদ বিধি শৌচাচার নাই মানি তাই।।" ইত্যাদি

হরিচাঁদ ঠাকুরের এই ঘোষণা ও ডাক সমাজে প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। একদিকে অস্পৃশ্য চন্ডালরা হরিচাঁদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে চাঙা হয়ে ওঠেন। উচ্চ বর্ণহিন্দুদের খবরদারি অস্বীকার করে মাথা তুলতে শুরু করেন। আর অন্যদিকে উচ্চ বর্ণহিন্দুরা চন্ডালদের দাবিয়ে রেখে তাদের চিরাচরিত শোষণ আধিপত্য বজায় রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা ও চক্রান্ত শুরু করেন। এই দ্বন্দ্ব সংঘাতের চিত্র আমরা লীলামৃত গ্রন্থের পাতায় দেখতে পাই -

" বেদ বিধি নাহি মানে, না মানে ব্রাহ্মণ।
নিশ্চয় করিতে হবে এ দলে শাসন।।"

এই দ্বন্দ্ব সংঘাতের সময়কাল আনুমানিক ১৮৪৫-১৮৫০ খৃষ্টাব্দে - যখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কলকাতার সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষ। আমাদের জানা দরকার, ১৮১৫ সালে প্রথম ইংরেজরা এদেশে সরকারি খরচে শিক্ষার প্রচলনের কাজ শুরু করে। সারাদেশের জন্য সর্বপ্রথম ইংরেজ সরকার মাত্র এক লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দ করে শিক্ষার জন্য, যা দিয়ে এত বড় দেশের সমস্ত মানুষের শিক্ষার ব্যবস্থা করা ছিল অসম্ভব। তাই, নিজেদের ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের সুবিধার্থে ইতিহাসবোধ সম্পন্ন ইংরেজরা মূলতঃ এদেশের ব্রাহ্মণদের ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ব্যবস্থা চালু হবার ৪০ বছর

পর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে ইংরেজ সরকার এবং ১৮৮৫ সালে অস্পৃশ্যদের শিক্ষার উপরও জোর দেবার কথা ঘোষিত হয়। ইংরেজ সরকারের সদিচ্ছা ও হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রাণপণ চেষ্টার সময়কাল মিলে যাওয়ায় চণ্ডালদের মধ্যে কিছু অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন মানুষের দেখা মিলতে থাকে। হরিচাঁদের আন্দোলনের সুফল মিলতে থাকে, ফলে আন্দোলন আরও জোরদার হতে থাকে, যার জন্য পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মণ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নেতৃত্বে বাংলার পশ্চিমপ্রান্তের ব্রাহ্মণ সমাজের যৌথ বিরোধিতাও হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রগতির আন্দোলনকে স্তিমিত করতে পারে নি। আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, ইংরেজ সরকার নীতি পরিবর্তন করে যখন অস্পৃশ্যদের শিক্ষার সুযোগ দানের কথা ঘোষণা করে তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় ইংরেজ সরকারকে চিঠি লিখে উপদেশ দেন যে, "আমার মতে ভারতবর্ষে শিক্ষা বিস্তারের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হলো আপাতত শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে যত্নশীল হওয়া।"

হিন্দু শাস্ত্র, নীতি-নিয়ম অঙ্গীকার করার নির্দেশ দিয়ে হরিচাঁদ দায়িত্ব শেষ করেননি। মানুষকে কী করতে হবে, কী করা উচিত, কীভাবে তা করতে হবে, তার নির্দেশ দিলেন এবং নিজ হাতে তা অনুশীলন করে সমাজকে শিক্ষা দিলেন। নিজের ছেলে গুরুচাঁদকে স্কুলে ভর্তি করলেন। অনাবাদী জমিতে নিজে চাষ করে ফসল উৎপাদন করে চাষীদের ঐসব জমিতে চাষ করতে উৎসাহিত করলেন। নিজ হাতে ব্যবসা করে উপার্জন করে সমাজের মানুষকে ব্যবসায় মনোযোগ দিতে বলেন। শাস্ত্রীয় অপপ্রচারের বিরুদ্ধে তিনি বলেন -

" অর্থ অনর্থের মূল কহে যেই ভণ্ড।
অর্থের জানে না অর্থ সেই অপগণ্ড।।" (লীলামৃত)

হরিচাঁদ ঠাকুর ঈশ্বরতত্ত্ব, পরলোক, জন্মান্তরবাদ, আত্মা প্রভৃতি আজগুবি ধারণাগুলির বিরোধিতা করে সংসার ধর্ম বা গৃহধর্ম অর্থাৎ পার্থিব জীবনকে সহজ সরল ও সুন্দর করে গড়ে তোলার উপর জোর দেন। ঈশ্বর শব্দটি মতুয়াধর্মের আকর গ্রন্থ দুটিতে ব্যবহৃত হয়েছে ঠিকই; কিন্তু তা মোটেই ঈশ্বরতত্ত্ব নয়। লীলামৃত গ্রন্থে ঈশ্বরের সংজ্ঞা দিয়ে বলা হয়েছে -

" যে যাহারে ভক্তি করে
সেই তার ঈশ্বর।"

আবার গুরুচাঁদ চরিতে বলা হয়েছে -
" যে যাহারে উদ্ধার করে
সেই তার ঈশ্বর।"

সাধারণভাবে ভক্তি শব্দটার সঙ্গে অন্ধত্বের একটা যোগসূত্র থাকে। কিন্তু লীলামৃত গ্রন্থে দুটি শব্দ ব্যবহার হয়েছে, তা হলো : জ্ঞানমিশ্র ভক্তি এবং শুদ্ধ প্রেম ভক্তি। তাতে বোঝা যায় এখানে যুক্তিপূর্ণ ভক্তিশ্রদ্ধার কথাই বলা হয়েছে, যে শ্রদ্ধার আসন রচিত হয় কর্মগুণে, সেবার মধ্য দিয়ে।

হরিচাঁদ ঠাকুর তার মতাদর্শ মূলতঃ ১২ টি নীতিকথার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন, যা দ্বাদশ আজ্ঞা নামে খ্যাত। তা হলো -

" করিবে গার্হস্থ্য ধর্ম লয়ে নিজ নারী।
গৃহে থেকে ন্যাসী বাণপ্রস্থী ব্রহ্মচারী॥
গৃহধর্ম রক্ষা করে বাক্য সত্য কয়।
বাণপ্রস্থী পরমহংসে তার তুল্য নয়॥
ঋতুরক্ষা করিবেক জীব হত্যা ভয়।
কেহ বা পূর্ণ সন্ন্যাসী মিথ্যা নিষ্কাম আশ্রয়॥
পর নারী মাতৃতুল্য মিথ্যা নাহি কবে।
পর দুঃখে দুঃখী সদা সচ্চরিত্র রবে।
দীক্ষা নাই, করিবে না তীর্থ পর্যটন।
মুক্তি স্পৃহাশূন্য নাই সাধন ভজন॥
যত যত তীর্থ আছে অবনী ভিতরে।
সত্য বাক্য সমকক্ষ হইতে না পারে॥
দেহের ইন্দ্রিয় বশ না হয়েছে যার।
তীর্থে গেলে ফলপ্রাপ্তি না হইবে তার॥

দেহের ইন্দ্রিয় বশ করেছে যে জন।
তার দরশনে সব তীর্থ দরশন॥
গৃহেতে থাকিয়া যার ভাবোদয় হয়।
সেই সে পরম সাধু জানিবে নিশ্চয়॥
গৃহধর্ম গৃহকর্ম করিবে সফল।
হাতে কাম মুখে নাম ভক্তিই প্রবল॥
কিসের রসিক ধর্ম কিসের বাউল।
ধর্ম যজি নৈষ্ঠিকেতে অটল আউল॥
কিবা শূদ্র কিবা ন্যাসী কিবা যোগী হয়।
যেই জানে আত্মতত্ত্ব সেই শ্রেষ্ঠ হয়॥
জীবে দয়া নামে রুচি মানুষেতে নিষ্ঠা।
ইহা ছাড়া আর যত সব ক্রিয়া ভ্রষ্টা॥

নির্দেশগুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় এখানে ব্যক্তিকেন্দ্রিক কোন স্বার্থপরতা নেই; বরং এখানে রয়েছে সমষ্টি ও সামাজিক মুক্তির পথ নির্দেশ। ব্যক্তি মুক্তির স্বার্থ চিন্তায় সন্ন্যাসগ্রহণ বা সংসার ত্যাগ করার জন্য মতুয়াধর্ম শ্রীচৈতন্য এবং গৌতম বুদ্ধকেও সমালোচনা করেছে লীলামৃত গ্রন্থে।

গৃহীর ধর্ম এবং সন্ন্যাস-বাণপ্রস্থের ধারণা পরস্পর বিরোধী। একইভাবে বস্তুবাদী ভাবনা এবং আধ্যাত্মবাদী ভাববাদী ধারণা এই দুটি বিষয়, মতবাদ ও দর্শন পৃথক এবং একে অন্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মবাদী ভাববাদী হিন্দুধর্মের প্রভাববলয় থেকে অস্পৃশ্য মানুষকে মুক্ত করে জীবনে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই হরিচাঁদ ঠাকুর বস্তুবাদী গার্হস্থ্য ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাই ধর্ম বলতে যে ধারণা প্রচলিত, মতুয়া ধর্ম তা নয়, এ হলো এক ধর্ম বিপ্লব। ধর্মের মোড়কে বস্তুবাদী দর্শনের অনুশীলন।

হরিচাঁদের আন্দোলনের ফলাফল নিয়ে আজ আর কোন গবেষণার প্রয়োজন পড়ে না। হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি দেবতা কয়েক হাজার বছর ধরে এইসব অস্পৃশ্যদের মনুষ্যেতর জীবনের গ্লানি দুর করতে পারে নি। হরিচাঁদের আন্দোলন

একশ বছরের মধ্যেই তাদের প্রগতির রাস্তায় সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

হরিচাঁদ নিজের পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরকে এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য নির্দেশ দেন। নিজের অনুগামী ও অনুসারীদেরও গুরুচাঁদকে সর্বতোভাবে মান্য করতে ও সহযোগিতা করতে আদেশ দেন। বাস্তবিকপক্ষে সবার সহযোগিতায় গুরুচাঁদ এই আন্দোলনে বিশেষ গতি সঞ্চার করতে সক্ষম হন। খৃষ্টান ধর্ম প্রচারক ডাঃ সি.এস.মিড সাহেবের সান্নিধ্য ও সহযোগিতা গুরুচাঁদ ঠাকুরকে সুবিধা এনে দেয়। বিশেষ করে রাজানুগ্রহ পেতে তাকে সাহায্য করে।

গুরুচাঁদ ঠাকুরের কার্যকাল ছিল এই মতুয়া আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়। এই পর্যায়ের আন্দোলনের বিশেষত্ব হলো - গুরুচাঁদ কীর্তন, মহোৎসবের মধ্যে একেবারেই যান নি। শিক্ষা আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, রাজনৈতিক আন্দোলন, নানা ধরণের সামাজিক উন্নয়নের আন্দোলন এবং সর্বোপরি অস্পৃশ্য সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

শিক্ষা আন্দোলনে গতি সৃষ্টি করার জন্য তিনি অস্পৃশ্য সমাজকে ডাক দিয়ে বলেন, —

" সবাকারে বলি আমি যদি মানো মোরে।
অবিদ্বান পুত্র যেন নাহি থাকে ঘরে।।
খাও বা না খাও তাতে দুঃখ নেই।
ছেলে মেয়ে শিক্ষা দাও এই আমি চাই।।" (গুরুচাঁদ ঠাকুর)

তার ডাকে মানুষ অভাবিত সাড়া দেন। গ্রামের পর গ্রামে গড়ে তোলা হয় পাঠশালা। গাছের ছায়ায়, গোয়াল ঘরে, বড় চৌরি ঘরের বারান্দায়, যেখানে যেমন সম্ভব হলো। কয়েক হাজার পাঠশালা তৈরি হলো। কিন্তু বিনা বাধায় একাজ করা গেল, এমন নয়। ওড়াকান্দি গ্রামের পাশেই বর্ণহিন্দু প্রধান গ্রাম ঘৃতকান্দি। সেখানকার মানুষের প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করা হয়েছে গুরুচাঁদ চরিতে।

" হিংসুক ব্রাহ্মণ যত ভাবে মনে মন।
উচ্চ শিক্ষা পায় যদি নমঃশূদ্র গণ॥
কিছুতে নিস্তার মোরা নাহি পাব আর।
নমঃশূদ্র হরিবেক সব অধিকার॥

.....

নমঃ জাতি নীচ তুমি বিদ্যা শিক্ষা নাই।
বিদ্যাহীন বলে মোরা তাদেরে চরাই॥
স্কুল যদি পায় তারা বিদ্বান হইবে।
আমাদের মান বাপু কভু না রহিবে॥"

শিক্ষা আন্দোলনে যে গতি সঞ্চারিত হয়, তা ধীরে ধীরে মিইয়ে আসে শিক্ষিত অস্পৃশ্যর চাকরি না জোটার কারণে। ১৮৯২ সালে উচ্চ বর্ণহিন্দুদের চাপে ইংরেজ সরকার এক সার্কুলার জারি করে সরকারি চাকরিতে অস্পৃশ্যদের নিয়োগ নিষিদ্ধ করে দেয়। ফলে গুরুচাঁদ ঠাকুরকে ঐ কালা সার্কুলার প্রত্যাহার করানোর জন্য আন্দোলন করতে হয়। ১৯০৭ সালে তিনি একাজে সফল হন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো, এই দাবি আদায়ে তাঁকে সুবিধা এনে দেয়।

যে কোন সমাজের উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের গুরুত্ব যে অপরিসীম জীবনের অভিজ্ঞতায় গুরুচাঁদ ঠাকুর তা বুঝতে পেরেছিলেন। আর তাই ঘোষণা করলেন, 'যে জাতির দল নেই, সে জাতির বল নেই। যে জাতির রাজা নেই, সে জাতি তাজা নেই।' বা (রাজনীতিতে) যদি হতে পার সেনাপতি, তবে হতে পারে গতি ইত্যাদি। গুরুচাঁদ ঠাকুর বাংলার বিধান পরিষদে তাঁর একান্ত অনুগামী ভীষ্মদেব দাসের জন্য মনোনয়ন আদায় করতে সক্ষম হন। নিরোদবিহারি মল্লিককে ১৯২১ সালে নির্বাচিত করতে তাঁর অনুগামিরা সর্বাত্মক চেষ্টা চালান এবং সফলতা লাভ করেন। এরা বাংলার বিধান পরিষদে আমূল ভূমি সংস্কার এবং তে-ভাগার দাবি উত্থাপন করেন। তাঁর প্রচেষ্টার ফলে চণ্ডাল নাম পরিবর্তন করে এক বিশাল জনগোষ্ঠীর নামকরণ হয় নমঃশূদ্র, ১৯১১

সালে। যদিও গুরুচাঁদ দাবি করেছিলেন নমো নামকরণ করার জন্য।

এছাড়া তাঁর অনুগামী দেবীচাঁদকে বিধবা বিবাহ প্রচলন করার জন্য দায়িত্ব দেন। শতাধিক বিধবার বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল স্বল্প সময়ের মধ্যে। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে তোলার কাজে তিনি সফল হয়েছিলেন। ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁরা কংগ্রেস নেতৃত্বে পরিচালিত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন। হিন্দুত্ব এবং হিন্দু আধিপত্যের আওতা থেকে তিনি অস্পৃশ্যদের অনেকটাই মুক্ত করতে সফল হয়েছিলেন। অস্পৃশ্যরা যে অনেকটা পথ সামনে অগ্রসর হতে সমর্থ হয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় আত্মসম্মানের দাবিতে কয়েকটি জেলা জুড়ে ১৮৭৩ সালের সাধারণ ধর্মঘটের মাধ্যমে। এই সাধারণ ধর্মঘটের দাবিগুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, অস্পৃশ্যদের মধ্যে ইতিমধ্যে চেতনা ও মর্যাদার প্রশ্নে আশাতীত অগ্রগমন ঘটেছে এবং দীর্ঘ লড়াই সুশৃঙ্খলভাবে চালিয়ে যাবার মধ্যে তাঁদের ঐক্যের দৃঢ়তা বোঝা যায়।

এতসব সাফল্যের মাঝেও দু'একটি ক্ষেত্রে গুরুচাঁদ ঠাকুরের সিদ্ধান্ত ও সমঝোতার ফলাফল নিয়ে দু'এক কথা বলা দরকার। হরিচাঁদ ঠাকুর নীতির প্রশ্নে কোন আপস করেছেন - এমন তথ্য জানা নেই, কিন্তু সবাইকে নিয়ে শান্তিতে পথ চলার প্রয়োজনে দু-একটি ক্ষেত্রে গুরুচাঁদকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সমঝোতা করতে হয়েছে বলে মনে হয়। তার একটি ঘটনা হলো - ওড়াকান্দি ঠাকুরবাড়িতে গুরুচাঁদের জীবদ্দশায় দুর্গাপূজা। পুত্র শশী ঠাকুরের পীড়াপীড়িতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও গুরুচাঁদ ঐ পূজার অনুমতি দেন। হয়তো পারিবারিক অশান্তি এড়াতেই তাঁর এই সিদ্ধান্ত। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের ফলাফল মারাত্মক হয়েছে বলে মনে করার অনেক লক্ষণ এখন দেখা যাচ্ছে। **হিন্দুত্ব থেকে মতুয়ারা নিজেদের যে বিচ্ছিন্ন করতে পারছেন না, এ ঘটনা তার এক বড় কারণ। এ হলো হরিচাঁদের মতাদর্শের থেকে বিচ্যুতির সূচনা বিন্দু।**

দীর্ঘ আন্দোলনের নানা ঘাত প্রতিঘাত ও বাঁক মোড়ে কখনও কখনও এগোনো-পিছনোর কৌশল নিতে হতে পারে। হয়তো গুরুচাঁদ ঠাকুর অনেক

ভেবে চিন্তেই এক পা পিছনে ফেলেছিলেন। পরবর্তী প্রজন্মের নেতৃবৃন্দের কর্তব্য হলো সে বিন্দুগুলিকে বা সিদ্ধান্তগুলিকে চিহ্নিত করা, বিচার বিশ্লেষণ করা এবং প্রয়োজনে সংশোধন করা। কিন্তু সে কাজ আর সম্ভব হয় নি।

গুরুচাঁদ ঠাকুরের পর নেতৃত্বের সিংহভাগ দায়িত্ব বর্তায় তাঁর নাতি উচ্চশিক্ষিত প্রমথরঞ্জন ঠাকুর মহাশয়ের উপর। কিন্তু দুভার্গ্যবশত তিনি উগ্র হিন্দুত্ববাদী নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি মহাশয়ের দ্বারা প্রভাবিত হন এবং পরবর্তীকালে কংগ্রেস নামক নরম হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দলের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে ফেলেন, এম.এল.এ, এম.পি, মন্ত্রী হন। দীর্ঘকাল তিনি হিন্দুত্ববাদের দ্বারাই প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হতে থাকেন। জীবনের শেষপ্রান্তে যখন তাঁর মোহমুক্তি ঘটে, যখন তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারেন, তখন ভুল সংশোধন করার মত বয়স ও শক্তি সামর্থ্য তাঁর ছিল না। যদিও সত্য ও সঠিক কথা বৃদ্ধ বয়সে তিনি বলেছেন, কিন্তু কার্যকর করার সময় তেমন পাননি। পতিত মানুষের জন্য তার বুক ভরা ভালবাসা ও সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, স্রোত উল্টোপথেই প্রবাহিত হতে থাকলো।

রসরাজ তারক সরকারের অপূর্ব সৃষ্টি শ্রীশ্রী হরি লীলামৃত গ্রন্থ। কবিগান গায়ক রসরাজ শ্রীশ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের দ্বারা প্রভাবিত মানুষ। তাই "গ্রন্থকারের অজ্ঞাতসারে প্রিয় পাঠ্যের ভাবধারা 'লীলামৃত' গ্রন্থ রচনাকালে পড়েছে।" ফলে হরিচাঁদের চিন্তা চেতনা ও কাজের বর্ণনার আগে পরে এমন সব কথা ও কাহিনী সন্নিবেশিত হয়েছে, যা মতুয়াদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করেছে এবং এ অবস্থাও হিন্দুত্ব থেকে মুক্তির সংগ্রামে বাধা সৃষ্টি করেছে। লীলামৃত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকা লিখেছেন হরিবর সরকার। সে লেখা থেকে জানা যায় - রসরাজের লেখা লীলামৃত গ্রন্থ হরিচাঁদের পছন্দ ছিল না এবং তিনি তা ছাপতে নিষেধ করেন।

আচার্য মহানন্দ হালদার উচ্চ শিক্ষিত মানুষ ছিলেন। তাঁর অমর সৃষ্টি শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ চরিত। পি.আর. ঠাকুর মহাশয়ের ন্যায় তিনিও উগ্র ও নরম হিন্দুবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। যার প্রমাণ পাওয়া যায়, লীলামৃত গ্রন্থের যে ভূমিকা

তিনি লিখেছিলেন তার মধ্যে। তিনি লিখেছিলেন 'গন্ডী হিসাবে হিন্দু ধর্মের রক্ষা করা এবং বিরাট বিশ্বজীবনে শান্তিময় গার্হস্থ্য জীবনের পূর্ণ শান্তি উপলব্ধি করানোই শ্রীশ্রী হরি ঠাকুরের আবির্ভাবের অন্তর্নিহিত সত্য।' সর্বোপরি লীলামৃত গ্রন্থের উৎসর্গ বক্তব্যে বলা হয়েছে - (শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্য) ' মৃতপ্রায় হিন্দু প্রাণ পাইয়াছে।'

এ সমস্ত উক্তি ও লেখনী হরিচাঁদ ঠাকুরের বস্তুবাদী মতাদর্শকে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু ধর্মের বোতলে বন্দি করার শক্তি জুগিয়েছে। যার ফলাফল স্বরূপ মতুয়া সমাজ মোটামুটি হিন্দুদের মতই আচার, আচরণ, পূজা-পার্বন এবং ব্রাহ্মণ পূজা, ভোজন, দক্ষিণা দিয়ে চলেছেন। মতুয়াদের হিন্দুদের থেকে আলাদা করে দেখা বা ভাবার অবকাশ কোথায়?

বহু বিকৃতি ও অসম্পূর্ণতা নিয়েও মতুয়াধর্ম তার কলেবর বৃদ্ধি করে চলেছে। বলা যায় অশ্বমেধের ঘোড়ার বেগে তা অগ্রসর হচ্ছে এবং তা অপ্রতিরোধ্য। সাম্প্রতিককালে মতুয়া সাহিত্য, মতুয়া ধর্মালোচনা ও প্রচারের ক্ষেত্রে হরিচাঁদের মৌলিক শিক্ষার প্রতিফলনও দেখা যাচ্ছে বেশি করে যা এক শুভ লক্ষণ। উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্বের সংগ্রামে নেতৃত্ব দান যেন গুরুচাঁদ ঠাকুরের স্বর্ণযুগের প্রতিধ্বনি। মতুয়ারা আবার সংগ্রামের ময়দানে ডংকা, কাঁশি, শিঙা, নিশান হাতে স্বদর্পে হাজির। সমস্ত দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে শ্রীধাম ওড়াকান্দি ও শ্রীধাম ঠাকুর নগর ঠাকুর বাড়ি থেকে এখন মতুয়াদের নির্দেশ দিতে হবে আর্দশ আচরণ বিধি পালন করার যাতে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুধর্ম, ধর্মবিপ্লবী মতুয়াদের আত্মসাৎ করতে না পারে, যাতে হরিচাঁদের বিপ্লবী মতবাদ চির ভাস্বর হয়ে থাকে। পি.আর.ঠাকুর মহাশয়ের স্ত্রী, আজকের বড়মা বীনাপাণি ঠাকুরের উপর মতুয়াদের গতিপথ পাল্টে দিয়ে সঠিক অভিমুখে পরিচালিত করার দায়িত্ব বর্তেছে।

চণ্ডাল এক আর্য ভাষী জনগোষ্ঠী

দুলালকৃষ্ণ বিশ্বাস

শূদ্র নামক এক আর্য-ভাষী জনগোষ্ঠীকে বৈদিক আর্য সমাজে আত্তীকরণ করার তাগিদেই বৈদিক আর্য-ভাষীদের মধ্যে বর্ণ বিভাজন ঘটান-তাদের সমাজের দার্শনিকবৃন্দ অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ। যাযাবর এবং পশুপালক আর্যভাষীরা এদেশের উন্নতর কৃষিসভ্যতায় উত্তীর্ণ হলে তাদের জনগোষ্ঠীতে শ্রম বিভাজন ঘটে। প্রাথমিক পর্যায়ে এই বিভাজনে তিনটি ধারা ছিল ঃ চিরায়ত পশুপালন, কৃষি এবং প্রতিরক্ষা। মূল জীবিকার সংগে যুক্ত লোকেরা তাঁদের ঐতিহ্য ধারণ করায় গোষ্ঠীগত জীবন দর্শনে দক্ষ ছিলেন। তাঁরাই হলেন তাদের মূলগোষ্ঠীর মুখ্যজন, ব্রাহ্মণ। প্রতিরক্ষার সংগে যুক্তলোকেরা তাঁদের মূলগোষ্ঠী জীবিকার অংশ ছিলেন বরাবর। তাঁরা হলেন গোষ্ঠীতে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ - ক্ষত্রিয়। বাকি যাঁরা কৃষি ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করলেন তাঁরা মূলগোষ্ঠী জীবিকাচ্যুত হওয়ায় গোষ্ঠীতে মর্যাদায় হলেন তৃতীয় —বৈশ্য। এরপর পরবর্তীতে আগত আর্য-ভাষীরা বৈদিক আর্য-ভাষী সমাজে আত্তীকৃত হলেন শূদ্র রূপে। এটি ছিল তাঁদের জনগোষ্ঠীগত নাম।

বৈদিক আর্যদের পূর্বেও নানা গোষ্ঠীর আর্য-ভাষীরা এদেশে এসেছিলেন। তাঁদের সংগে নবাগত বৈদিক আর্য-ভাষীদের যুদ্ধ এবং সহাবস্থান ঘটেছে। 'দাস' নামক আর্য-ভাষী জনগোষ্ঠীরও আত্তীকরণ ঘটে একই ভাবে। ডঃ রামশরণ শর্মা তাঁর প্রাচীন ভারতে শূদ্র গ্রন্থে এ বিষয়ে জানাচ্ছেন ঃ

" যাই হোক, এতক্ষণ যা বলা হলো তার ভিত্তিতে এটাই সম্ভাব্য বলে মনে হয় যে, দাসদের মত শূদ্ররাও ছিলেন ইন্দো-আর্যদের স্বজাতি।' (পৃ : ৩০)

পরবর্তীকালে যদিও বর্ণ ব্যবস্থা থেকে নির্দিষ্ট পেশা ভিত্তিক 'জাত'পরিচয় দিয়ে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের মানুষদের নানা গোষ্ঠীকে সূচিত করা হয়েছে, চন্ডালরা কিন্তু ঐরূপ কোন পেশা ভিত্তিক ' জাত ' নয়। তাঁরাও 'শূদ্র', ' দাস' এবং

তথাকথিত ইন্দো-আর্যদের মতই এক বহিরাগত জনগোষ্ঠী এবং তাঁরাও আর্য-ভাষী। মূল বৈদিক আর্যদের মধ্যে এই চন্ডালদের অল্প বিস্তর আত্তীকরণ ঘটলেও অন্যরা মূলত তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ধরে রেখেছিলেন। আত্তীকৃতদের সম্পর্কে কিছুটা আভাষ পাওয়া যায় ভবিষ্য পুরাণে। ডঃ শর্মা জানাচ্ছেনঃ -

'ভবিষ্য পুরাণে' প্রায় বারোজন ঋষির একটি তালিকা আছে, যাদের মায়েরা শূদ্রবর্ণের কোন না কোন শাখার অংশীভূত ছিলেন বলে ধরা যেতে পারে। ... এতে বলা হয়েছে, ব্যাস ছিলেন ধীবর রমণীর সন্তান, পরাশর শ্বপাক রমণীর, কপিঞ্জলাদ চন্ডালিনীর, বশিষ্ঠ গণিকার ও মুণিশ্রেষ্ঠ মদন পালের জননী নৌকা পারাপার করতেন। ... রাজা ও প্রধানরাও শূদ্র বিবাহ করতেন বলে মনে হয়।" (ঐ, পৃ : ৬৬)

"স্পষ্টতই ডঃ শর্মা চণ্ডালিনীকেও শূদ্রবর্ণের একটি শাখা হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তেমনি শ্বপাক, যাঁরা আর্যদের শূদ্র সমাজে আত্তীকৃত হয়েছিলেন। এবং গণিকা তো কোন শূদ্র শাখাই নয়। কিন্তু এই সব মুনি ঋষিরা শেষ পর্যন্ত আর্যদের দার্শনিক তথা ব্রাহ্মণ। এমন কি ডঃ শর্মা জানাচ্ছেন - তথাকথিত উচ্চবর্ণের পুরুষ শূদ্রা বিয়ে করতেন।

'উল্লিখিত উদাহরণগুলো থেকে দেখা যায় উচ্চবর্ণের পুরুষের সংগে শূদ্রার বিবাহের কোন অসমর্থন ছিল না।' (ঐ পৃ:৬৭)।

সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্রে আর্যরা বিবাহ প্রতিষ্ঠানকে খুব যে একটা গুরুত্ব দিতেন না সে আমরা জানি। তেমন ক্ষেত্রে ঐসব সন্তানেরা পিতৃতান্ত্রিক আর্য সমাজে পিতৃপরিচয়ও পেতেন। আসলে তখনও আর্য সমাজে উচ্চনীচ ধারণাটা দৃঢ়তা পায়নি। আর তা পায়নি বলেই ঐসব ঋষিরা আর্য সংস্কৃতি চর্চার সূত্র ধরে আর্য সমাজে সহজেই গৃহীত হয়েছিলেন। খুব সম্ভব ব্রাহ্মণ্য জৈবিক উত্তরাধিকার থেকে ডঃ শর্মা অবচেতন ভাবে এই ' উচ্চ নীচ' বর্ণভেদ করেছেন। কেন না তাঁরই কথা থেকে আমরা জানতে পারি -

" চণ্ডাল পরিবারে জন্মের জন্য ঘৃণা এবং শূদ্রদের উপর আরোপিত কিছু দোষের নিদর্শন অবশ্য পাওয়া যায়, কিন্তু তার অধিকাংশই দেখা যায় বেদোত্তর কালে। (ঐ, পৃ: ৮২)

স্পষ্টতই আমরা জানতে পারছি চণ্ডালরা শূদ্র নয়। অর্থাৎ, চণ্ডালরা বর্ণ-ব্যবস্থা ভিত্তিক আর্য সমাজ বহির্ভূত এবং এই শূদ্র বা চণ্ডাল ঘৃণার যে ভিত্তি - বর্ণের উচ্চ নীচ অবস্থান - তা ঘটেছিল বেদোত্তর কালে। 'চণ্ডাল পরিবার' শব্দবন্ধ স্পষ্টতই একটা স্থায়ী বর্ণ বিভাজনের ইঙ্গিত। যখন তার বর্ণ পেশা ভিত্তিক ছিল তখন কোন পরিবারকে কোন বিশেষ পেশার বা বর্ণের বা জাতের পরিবার বলা চলে না। কোন পরিবারকে পেশার সংগে চিহ্নিত করা যায় তখনই যখন ঐ পরিবারের সবলোক কেবল একটা মাত্র নির্দিষ্ট পেশা গ্রহণ করতে পারতেন। 'চণ্ডাল' কোন পেশা নয় বলে ' চণ্ডাল পরিবার' দ্বারা চণ্ডাল জনগোষ্ঠীকেই বুঝতে হবে। যেহেতু চণ্ডালরা বর্ণভিত্তিক আর্য সমাজ বহির্ভূত এক আর্যভাষী জনগোষ্ঠী বা ' জনজাতি', তাই তাদের তরফে বর্ণব্যবস্থার রীতি পদ্ধতি অনুসরণ করার প্রশ্নই ওঠে না। অতএব, চণ্ডাল ঘৃণা কার্যত জনগোষ্ঠীগত স্বাতন্ত্র্যবোধজাত ঘৃণা।

বেদোত্তর কালে যখন পৌঁছে গেছে এই সমাজ তখন বর্ণব্যবস্থা স্থায়ী জাত ব্যবস্থার রূপ পরিগ্রহ করেছে। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রের সাহায্যে শূদ্রকে দিয়ে তাদের জৈবিক জীবন প্রক্রিয়ার অপরিহার্য কিন্তু অনভিপ্রেত কাজ করিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছে। জন্মের সংগে পেশার সংযোজন স্থায়িত্ব পেলে শূদ্রের কাজকে নিন্দা করা যায়, আবার তাকে দিয়ে ঐ অপরিহার্য ও অনভিপ্রেত কাজ করিয়েও নেওয়া যায়। মনে রাখতে হবে,শূদ্ররা কিন্তু বর্ণব্যবস্থার অভ্যন্তরের লোক, চণ্ডালরা বর্ণবহির্ভূত। বেদোত্তর কালে যখন বৈদিক আর্য সমাজের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র দৃঢ়তা পেয়েছে তখনই শূদ্ররা ঘৃণিত, কিন্তু চণ্ডাল সর্বদাই ঘৃণিত ঐ উপজাতীয়তা বোধ থেকে। চণ্ডালদের প্রতি এই ঘৃণা কেবল উপজাতীয় স্বাতন্ত্র্য হেতু নয়, এ ঘৃণা ছিল আবার বৈদিক আর্যদের সমাজনীতি অর্থাৎ বর্ণব্যবস্থার

অস্বীকৃতি হেতু - কী বেদোত্তর কালে, কী বেদ পূর্ব কালে। এবং শূদ্র ঘৃণা ও চণ্ডাল ঘৃণার মধ্যেও একটা মৌলিক পার্থক্য ছিল। ডঃ শর্মা জানাচ্ছেন ঃ

" বলা হয়েছে যে সদাচারী লোক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য রূপে উত্তম পূণর্জন্ম লাভ করবেন, কিন্তু কদাচারী লোকে প্রবেশ করবে কুক্কুরী, শূকরী অথবা চণ্ডালিনীর পুতি গন্ধময় যোনিতে (ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৫/১০/৭)। লক্ষণীয় যে, চণ্ডালদের ক্ষেত্রে যেমন বলা হয়েছে, শূদ্রবর্ণে জন্ম গ্রহণকে কিন্তু সেইরকমভাবে অপবিত্র ('কপূয়াম) বলা হয়নি, যদিও মনে হয় সে জন্মকে অবাঞ্ছিতই দেখা হতো।" (ঐ পৃ:৬৭)

দেখা যাচ্ছে চণ্ডাল ঘৃণা এতটাই তীব্র যে কদাচারী মানুষের 'পূণর্জন্ম' ঘটবে মনুষ্যেতর প্রাণিতে অথবা চণ্ডালিনীর গর্ভে। চণ্ডাল এবং পশুকে এই ব্রাহ্মণ্যঘৃণা একাসনে বসিয়েছে। তাদের নিজেদের সমাজের লোকদের এই ' সদাচার' নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণের নির্ধারিত নীতি রীতি ? তা মান্য না করাই কদাচার। এই কদাচারীরা নিতান্তই যদি তাদের 'পূণর্জন্মে' মনুষ্য জন্ম পায় তবে তা সে পাবে চণ্ডালিনীর গর্ভে। এই ব্রাহ্মণ্য নৈতিকতা অমান্য করার বিরুদ্ধে এরূপ ভীতি প্রদর্শন থেকে বুঝাতে পারা যায়, বৈদিক আর্য সমাজে অবরুদ্ধ স্বল্প সংখ্যক চণ্ডালের জীবন ধারণ কতটা পাশবিক স্তরে রেখেছিল ব্রাহ্মণ্য রাষ্ট্র। অপর দিকে ব্রাহ্মণ্য সমাজের বাইরে থাকা চণ্ডাল জনগোষ্ঠীর স্বাধীন অস্তিত্ব নিশ্চয় ব্রাহ্মণ্যবর্ণ তথা স্থায়ী জন্মপেশার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এই ব্যবস্থার সুবিধাভোগীদের নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটাতো।

অবশ্য যদিও এই পর্যায়ে চণ্ডালকে অপবিত্র বলা হয়েছে, কিন্তু তথাপি চণ্ডাল অস্পৃশ্য ছিল না। ব্রাহ্মণ্য দর্শনের অমানবিক এক অবদান হলো বর্বর পর্যায়ের মানুষদের মত যজ্ঞে নরবলি দান, তাদের 'দেব দেবতাদের' উদ্দেশ্যে। এই নরবলি দানে চণ্ডাল ছিল তাদের ভারি পছন্দের তালিকায়। আর এজন্যই তখন চণ্ডালকে অস্পৃশ্য করার অসুবিধা ছিল। কিন্তু চণ্ডাল গোষ্ঠীর যে মানুষ আর্য ব্যবস্থায় আত্মসমর্পণ করতেন তিনি সমাদর পেতেন, যা কিন্তু শূদ্রের ক্ষেত্রে

পাওয়া যেত না। তাই তো ঋষি কপিঞ্জলাদ চণ্ডালিনীর গর্ভজাত হলেও তিনি ছিলেন আর্য ঋষি। কারণ, তিনি ছিলেন আর্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি চর্চায় নিবেদিত। মায়ের কোলে লালিত কপিঞ্জলাদ এর মাতৃভাষা নিশ্চয়ই বৈদিক আর্যদের ভাষা থেকে খুব একটা পৃথক ছিল না।

রামায়ণে অবশ্য গুহক চণ্ডালকে রাম বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। রামায়ণ-এর রচয়িতা ব্রাহ্মণ্য সমাজে স্বীকৃতি পাওয়ায় চণ্ডালদের ব্রাহ্মণ্য দাসত্ব মেনে নিতেই এমন এক কাহিনীর অবতারণা বলে মনে হয়। কিন্তু সেটা অন্য প্রশ্ন। এ কাহিনী চণ্ডালদের ব্রাহ্মণ্য সমাজ-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র এক অস্তিত্বের স্বীকৃতি কেবল নয়, এখানে নৃপতি গুহক এক চণ্ডাল গোষ্ঠীপতি। কিন্তু রামায়ণের চণ্ডালের গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ বলে জানানো হয়েছে। (১/৫৮/১০-১১)। অতএব, প্রশ্ন উঠবে, এমন ক্ষেত্রে চণ্ডালকে আর্যভাষী বহিরাগত জনগোষ্ঠী মানা যায় কী ভাবে?

রামায়ণের কাল, হলো প্রাথমিক পর্যায়ে, খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী। এ সময়ে শূদ্ররা সার্বিকভাবে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের শিকার। অতএব, বাঁচার তাগিদে তাদের দেশীয় নানা জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসতে হয়েছে। একই ভাবে বৈদিক আর্য প্রভাবিত অঞ্চলের বাইরে ছড়িয়ে পড়া চণ্ডালদের সংগে প্রাগার্য নানা জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণ শুরু হয়ে গেছে। কাজেই রামায়ণের কালে কৃষ্ণত্বকের চণ্ডাল কোন আশ্চর্য ঘটনা নয়, যেমন কৃষ্ণত্বকের ব্রাহ্মণও বহু শত বৎসর ধরেই এমন কি তথাকথিত আর্য ভারতেও যথেষ্ট সংখ্যায় বর্তমান। স্বয়ং রামও 'দূর্বাদলশ্যাম'। বহুদিন পর যখন ধর্মসূত্র রচিত হচ্ছে, যখন বৈদিক সংস্কৃতি রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতিতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, তখন প্রাগার্যদের আর্যভাষীদের সমাজে আত্মীকরণের জন্য বলপ্রয়োগের পরিবর্তে সাংস্কৃতিক উপায় উদ্ভাবিত হয়, যাতে বিপুল সংখ্যক প্রাগার্য মানুষ আর্য আধিপত্য সাগ্রহে মেনে নেয়। এই প্রচেষ্টার থেকে রচিত হতে থাকে নানা পৌরণিক কাহিনী, যা থেকে প্রাগার্যরা নিজেদের একদিকে যেমন আর্যভাষীদের স্বজন ভাবে, অন্যদিকে 'উচ্চতর' তিনবর্ণ সাপেক্ষে হীনমন্যতাতেও আক্রান্ত হয়। এই ব্রাহ্মণ্য দার্শনিক প্রচেষ্টাকে হাসির

রাজা শিবরাম চক্রবর্তী বলেছেন 'দিব্যদর্শন' ঃ

" কিন্তু সেকালের ব্রাহ্মণ ধর্মনীতির সঙ্গে অর্থনীতির যে সমন্বয় সাধন করেছিলেন, তা আজো অক্ষুন্ন রয়েছে— তাঁরা সেই প্রাচীন যুগে যে শোষণ যন্ত্র স্থাপন করে গেছেন, তার যন্ত্রণাহীন চক্রতলে নিষ্পিষ্ট হতে আজও আপনা থেকেই লোক এগিয়ে আসে। সত্যি দিব্যদর্শন ছিল বইকি তাঁদের। কেন না, এই মানুষ পেষা কল চালিয়ে তাঁদের বংশধরেরা যে চিরকাল ধরে খাবে, এটা তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন।

(শিবরাম চক্রবর্তীর প্রবন্ধ 'শূদ্র না ব্রাহ্মণ?' দ্রষ্টব্য — চেতনা লহর, প্রথম সংখ্যা)

এমনই এক প্রচেষ্টা হলো বৌধায়ন-এর ধর্মসূত্র। এই ধর্মসূত্র মতে চন্ডাল হলো শূদ্র পিতা ও ব্রাহ্মণী মাতার সন্তান। (ভেবে দেখুন, যাদের চণ্ডাল বলে ধরা হয় সেই চণ্ডালরা এমন এক বিশাল জনগোষ্ঠী যার উৎপাদন সমস্ত সন্তানধারণক্ষম ব্রাহ্মণী ও সন্তান উৎপাদনক্ষম শূদ্রের মিলনে সম্ভব নয়। এই দার্শনিকদের বাস্তবতা বোধ তাঁদের গোষ্ঠীস্বার্থে হারিয়ে যায়।) এতে অবশ্য এক ঢিলে দুই পাখি মারা গেল। ব্রাহ্মণী শূদ্রের শয্যাসঙ্গিনী হওয়ায় শূদ্রের প্রতি ব্রাহ্মণের ক্রোধ, বিদ্বেষ ও ঘৃণাকে চিরস্থায়িত্ব দেওয়া গেল এবং অপরদিকে আত্মীকৃত চণ্ডালকে এক হীনমন্যতায় বেঁধে ফেলা গেল।

বস্তুত আর্যভাষী হয়েও চণ্ডালরা যেমন ব্রাহ্মণ্য আর্য ভাষীদের ঘৃণা ও বিদ্বেষের লক্ষ্য হয়েছেন, তেমনি তাঁরা বৌদ্ধদেরও ঘৃণার পাত্র ছিলেন। এ সম্পর্কে ডঃ শর্মার কথা ঃ

" পালি রচনায় চণ্ডালরা স্পষ্টতই অস্পৃশ্যরূপে চিহ্নিত। পরবর্তী একটি 'জাতক' কাহিনীতে চণ্ডালদের বর্ণনা করা হয়েছে পৃথিবীর হীনতম মানুষ হিসেবে (জাতক ৪র্থ, পৃ: ৩৯৭)।" (ঐ পৃ: ১২৯)

যে-বৌদ্ধ ধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নিপীড়িতদের একদা কোল দিয়েছে সেই ধর্মের কেবল সাধারণ জন ন'ন, ভিক্ষুরা পর্যন্ত চণ্ডালদের সম্পর্কে ব্রাহ্মণ্য ঘৃণার উত্তরাধিকার বহন করে চলেছিলেন। *বিনয় পিটকে* বলা হয়েছেঃ

'শ্রমণদের বুদ্ধ বিশেষভাবে বুঝিয়ে ছিলেন, তারা যেন ভিক্ষুদের পূর্বের জাতি, শিল্প, কর্ম ইত্যাদি উল্লেখ করে অপমান সূচক কথা বলে সংঘে ভেদ সৃষ্টি না করেন।' (*বিনয় পিটক*, ৪র্থ, পৃ:৪-১১)

বুদ্ধের অনুগামীরা বুদ্ধের নির্দেশ উপেক্ষা করেছেন। কেন? এ প্রশ্নের উত্তরও চিহ্নিত করা যায়। ডঃ শর্মা আমাদের জানাচ্ছেনঃ

" সাধারণভাবে উচ্চতর বর্ণের সব লোকই চণ্ডালদের অস্পৃশ্য বলে ঘৃণা করতেন, কিন্তু বিশেষভাবে তাদের ঘৃণা করতেন ব্রাহ্মণরা, 'জাতকের' উল্লেখগুলো থেকে এমন ইঙ্গিতই পাওয়া যায়।" (ঐ, পৃ: ১২৯)

তিনি আরো লিখেছেনঃ

" কিন্তু লক্ষণীয় যে চণ্ডাল বিষয়ে অধিকাংশ উল্লেখই পাওয়া যাচ্ছে পরবর্তী ' জাতক' কাহিনীতে, বিশেষত চতুর্থ খণ্ডে।" (ঐ পৃ: ১৩০)

এখন আমরা বৌদ্ধদের চণ্ডাল ঘৃণার উৎস খুঁজে পেলাম। আমরা আরো জানলাম এ পর্যায়ে চণ্ডাল কেবল ঘৃণিত নয়, অস্পৃশ্যও। যখন বৌদ্ধধর্ম রাজধর্মের মর্যাদা পেয়েছে তখন রাজানুগ্রহের কাঙাল, রাষ্ট্রের ক্ষমতা কেন্দ্রের মধ্যমণি ব্রাহ্মণরা ঝাঁকে ঝাঁকে বৌদ্ধ বনে গেছেন এবং অতএব বুদ্ধের নির্দেশ উপেক্ষা করে বৌদ্ধ ধর্মে ব্রাহ্মণ্য দর্শন সংযোজিত করে ' মহাযান' বৌদ্ধমত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে মানব-ঘৃণার অনুপ্রবেশ ঘটালেন ব্রাহ্মণদের থেকে আসা নব ভিক্ষুর দল। লক্ষ করা যেতে পারে, "চণ্ডালদের বিশেষ করে ঘৃণা করতেন ব্রাহ্মণরা।" বৌদ্ধ বনে গিয়েও ব্রাহ্মণ তাঁর চণ্ডাল ঘৃণার উত্তরাধিকার বর্জন করতে পারেন নি। এই ঘৃণা যেন তাঁর জিন কোডে

বাহিত হয়ে ভিক্ষু জীবনেও প্রবেশ করেছে। বুঝতে পারা যায় চণ্ডালের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ব্রাহ্মণ্য স্বার্থের এতটাই প্রতিকূল যে ধর্মান্তর এবং প্রজন্মান্তরেও তাঁরা তাঁদের চণ্ডাল ঘৃণার স্মৃতি বহন করেছেন। এমন যে বৌদ্ধ ঘৃণিত চণ্ডাল, তাঁরাও বৌদ্ধ শিক্ষায় আগ্রহী ছিলেন। ডঃ শর্মা জানাচ্ছেনঃ

"পরবর্তী একটা 'জাতকে' আছে যে দুটি চণ্ডাল বালক বিদ্যা শিক্ষার জন্য ছদ্মবেশে তক্ষশিলা গিয়েছিল। অনবধানতাবশত নিজেদের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলায় তারা ধরা পড়ে যায়, এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের বহিষ্কার করা হয়।" (জাতক ৪র্থ, পৃ : ৩৯১ - ৯২) (ঐ , পৃ-১২৪)

মনু সংহিতায় বা অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রে চণ্ডালদের যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে তাতে চণ্ডাল বালকদের আর্যভাষী বিদ্যা শিক্ষায় আগ্রহী হওয়ার কথা নয়। লক্ষণীয় যে নিজেদের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলার পূর্বে তাদের চণ্ডাল রূপে চিহ্নিত করা যায়নি - না চেহারা দিয়ে, না তক্ষশিলার আর্য-ভাষার উচ্চারণ দিয়ে। তাদের গোষ্ঠী জীবনের বিচ্ছিন্নতা হেতু তাদের উচ্চারিত আর্য-ভাষায় আঞ্চলিকতা দোষ ঘটতেই পারে, যেমন একই বাংলা ভাষার রূপ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ঐ একদা বিচ্ছিন্নতা হেতু। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্য ভাষীদের আর্য-ভাষা শিখে নিতে হতো। স্পষ্টতই এই দুই বালককে আলাদা করে আর্য ভাষা শিখতে হয়নি বিদেশীদের মত। অর্থাৎ এদের নৃতাত্ত্বিক গঠন ও ভাষা ছিল আর্য-ভাষীদের মতই, চণ্ডাল হিসাবে তারা ধরা পড়ে কেবল তাদের আর্য-ভাষায় আঞ্চলিকতা দোষ হেতু।

ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রীদের চণ্ডাল ঘৃণা এখনও অব্যাহত, অব্যাহত তাই সামাজিক বৈষম্য এবং অতঃপর অব্যাহত সামাজিক সাংস্কৃতিক স্থবিরতা তথা প্রত্ন স্মৃতির বৈদিক উত্তরাধিকার।

মৌল ও লৌকিক ইসলাম
- তুলনামূলক আলোচনা

শুভপ্রতিম রায়চৌধুরী

তথ্য -১

লোটফি , ইরানের বারান সংগীত দলের গায়িকা, স্থান কলকাতার এক সুফিগানের ওয়র্কশপ। চোখ বোঁজা, হাত দুটি ওপরে নাচের ভঙ্গিতে ..... বুঁদ হয়ে আছেন একটি গানে। মঞ্চে তখন গান ধরেছেন সুফি শবনম, বাংলাদেশের লালন গোষ্ঠীর —

বলি মা তোর চরণ ধরে, ননি চুরি আর করবোনা

আর আমারে মারিস নে মা .....

সমবেত, আফগান, তাজিক, সিরিয়, মিশরিয়, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সুফিগানের সদস্যদের একই অবস্থা। এক হাত উপরে এক হাত নিচে রেখে বিশেষ সুফিনাচের রীতিতে নিজকেন্দ্রে প্রদক্ষিণ রত। চোখে এক অনাবিল আনন্দ, সুরের মুর্ছনায়। সমাপ্ত হলে সুফিগান, 'গান হলো প্রেমের রহস্য এবং প্রেম হলো ঈশ্বরের রহস্য', বললেন লোটফি। বললেন, সৌন্দর্যের প্রশংসা এবং তার জন্যে হৃদয়ের অনুভূতিকে উজ্জেজিত করতে ধ্বনির প্রয়োজন। ধ্বনিতে সৌন্দর্য ও সদিচ্ছা থাকে, তাই সংগীত সুফিদের কয়েকটি সম্প্রদায়ের কাছে আবশ্যক। যা নিয়ে শরিয়ত বা মৌল ইসলামের আপত্তি। আফগান সুফিগায়ক মীর আফগান হামিদি যেমন বললেন, ' তালিবান আমলে বন্ধ ছিল সমা, কত সুফিদল অত্যাচারে, হত্যায় নির্মূল হয়েছে তার পরিসংখ্যান নেই। তবুও শেষ করা যায়নি আমাদের। ওরা আমাদের ঘর জ্বালিয়েছে শিশুকেও রেহাই দেয়নি, তবু কালো বোরখার ভেতর থেকে মায়ের কান্না হয়ে, আজান হয়ে ফিরে এসেছে গান।

একটা কবিত শোনালেন হামিদি, ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের লেখা -

আজিজ -এ আহল - এ - সিতম কি বাত করো
ইশক কি দম -কদম কি বাত করো।

(পাষণ্ডের ভরসাহীনতার কথা বলো, ভালবাসার ক্ষমতার কথা বলো)

তথ্য -২

বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক শক্তিনাথ ঝা, মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্নস্থানে গিয়ে বাউল ফকিরদের নিয়ে অনেক কাজ করেছেন। এখানে তার অভিজ্ঞতার কয়েকটি তথ্য দেওয়া হলো ।

লালনের নামে প্রচলিত গানে কোথাও নিজেকে তিনি বাউল বলেননি। লালনের শিষ্যরা গুরুকে সাঁই, দরবেশ বলতেন। 'দরবেশ' ফারসি ভাষার শব্দ, তুর্কি ও আরবিতে এর সমার্থক শব্দ বলতে শেখ, ফকির, সুফি, জাহিদ, ইত্যাদিকে বোঝায়। ইসলাম সন্ন্যাস ও ভিক্ষাকে সমর্থন না করলেও সুফিবাদে এর প্রচলন আছে। সুফি নামের আড়ালে প্রতিবাদী গোষ্ঠীগুলো একত্রিত হতে থাকে। বলা হয় সুফিবাদ যদি এক দর্শন হয় তবে ফকিরি তথা দরবেশপন্থা তথা বাউল তার বিশিষ্ট জীবনধারা। অপেক্ষাকৃত বেশি রক্ষণশীল সুফি সাধকেরা তুলনায় কম আচার মানেন। এমন সাধকদের বে শরা বা অবৈদিক বা অনাচার বা বাউল ফকির বলা হয়।

বাউল ফকিরদের ২১৮ টি পরিবারের মধ্যে সমীক্ষা করে সাধুমত, ইসলাম, বৈষ্ণব, আত্মতত্ত্ব, দরবেশ, নকসাকদী ইত্যাদি বিভিন্ন মতের সম্প্রদায় পাওয়া যায়। যেমন বাউল ১৫৫টি পরিবার, ফকির ১৫৬টি , দরবেশ ১৪২টি, মারফতি ১৬০ টি, মানুষ ১৫৭ টি, বৈষ্ণব ৮৩টি পরিবার। দেবতা এবং ব্যক্তিগণকে মেনে চলার নিরিখে দেখা যায়, মহম্মদকে মেনে চলেন ২০২ টি পরিবার, চৈতন্যদেব ১৮২, আলি ২০০, ফতেমা ১৮৮, রাধা ১৮০, কালী ১৮২ , শিব ১৭৯, কৃষ্ণ ১৭৮টি পরিবার। সকল শিষ্যরা এক সাথে খায়, থাকে, করণক্রিয়া

করে। মুসলমান গুরুভাইদের এবং ব্রাত্য সমাজের গুরুভাইদের বাড়িতেও খাদ্যগ্রহণ করে। বৈষ্ণবদের একাংশ - দাসমুচি, যুগিরা গোঁসাই গোপালের ও কর্তাভজা মতের ভক্তরা মুসলমান সাধকের গৃহে এবং সাধু সেবায় অন্ন গ্রহণ করে থাকেন। জাত ধর্মের বিচার বাউলদের (হিন্দু-মুসলমান) মধ্যে নেই বলে দুই ধর্মের রক্ষণশীল অংশ এদের ওপর খাপ্পা।

তথ্য - ৩

হুগলি জেলার পাণ্ডুয়া এক ঐতিহাসিক স্থান। এখানে জিটি রোডের পাশে মাজার, হজরত শাহ সুফি সুলতানের। ফি বছর ১লা মাঘ থেকে প্রায় এক মাস সামনের মাঠে মেলা হয়। মেলায় আগত মানুষের দান জমা হয় ' দানবাক্স'তে। মাজারের দায়িত্বপ্রাপ্ত দুই খাদেম পরিবার এর অধিকারী। মাজার সংলগ্ন জমিতে পরে মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মিত হয়। মাদ্রাসাটি খারিজী এবং জমিয়ত উলেমায়ে হিন্দ-এর অনুমোদিত।

এখানে মসজিদ - মাজার বিরোধ বহুকালের। মাজারটি মারফতি, তাকে শরিয়তি করবার চেষ্টা কয়েক দশক আগে থেকেই চলছে। হুগলির ফুরফুরা শরিফ -এর প্রত্যক্ষ মদতে বিভিন্ন মাজারকে ঘিরে এই প্রচেষ্টা চলছে। পাণ্ডুয়ার মিশ্র জনবিন্যাস, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে মাজারকে ঘিরে আগ্রহ, হজরত শাহ-র প্রতিশ্রদ্ধা এক্ষেত্রে কিছুটা প্রতিরোধ বজায় রেখেছে। খাদেম লাল মহম্মদের কথায়, একবার বাধা দিয়ে দেখুক না, মানুষ তা মানবেই না। বিহারীরা তো কিছুতেই না।

বাধা অবশ্য প্রতিনিয়ত আসছে মসজিদ থেকে। মসজিদের ইমাম আবদুল রউফ, বর্দ্ধমানের মানুষ। মাজারে ধূপকাঠি জ্বালানো হয়, নকুলদানা দেওয়া হয়, চাদর চড়ানো হয়, মুসলিমরাও মাজারে এসে প্রণামের ভঙ্গি করে। ইমামের ফতোয়া — এসব চলবে না। মাজারে এসে মাথা নিচু করা 'শিরক'। পীরের কবরে ধূপ জ্বালানো, চাদর চড়ানো মানে কবর পুজো করা। এসব ইসলাম

বিরোধী, পৌত্তলিক, এর স্থান নেই। এমনিতেই মাজারের ভেতরে মহিলাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছে। তারা দূর থেকে প্রণাম করে যায়।

* * * * * *

শরিয়তি ইসলাম ও সুফিবাদ

মৌল ইসলাম থেকে সুফিবাদের জন্ম হলেও শরিয়ত ও সুফিমতবাদের মধ্যে পর্যাপ্ত মতপার্থক্য আছে। সুফিবাদকে লৌকিক ইসলামের আকর বলা যেতে পারে, যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুফিবাদ ও শরিয়তি ইসলামের একাত্মতা বর্তমান। চৈতন্যের মৃত্যুর পরে যেমন বৈষ্ণবধর্মর কিছু অংশ মননশীল শাস্ত্রচর্চাকে গুরুত্ব দিতে থাকে, ফলে সাধারণ মানুষ থেকে ক্রমে দূরে সরে যেতে যেতে ব্রাহ্মণ্যবাদের করালগ্রাসে গ্রাসিত হয়, তেমনি সুফিবাদ। মারফতিকে শরিয়তি করার, সুফিসংগীতকে শেষ করার তথ্য আমরা পেয়েছি। এও জেনেছি সুফিবাদ তথা লৌকিক ইসলাম-এ, মা যশোদাকে শিশু কৃষ্ণের আকুতি নিয়ে লেখা গানে, রাধা কৃষ্ণের প্রেমে কোন আপত্তি নেই।

শরিয়তি বা মৌল ইসলাম ও সুফিবাদের মতভেদগুলি -

১। শরিয়তি ইসলাম বাহ্য আচরণ নির্ভর, সুফিরা অন্তরের শুদ্ধির ওপর বেশি জোর দেয়।

২। শরিয়ত অন্ধ আনুগত্য, ঈশ্বরের প্রতি ভয় করতে শেখায়, সুফিবাদ 'ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর জন্যে প্রেমই হল একমাত্র উপায়' একথা বলে।

৩। সুফিবাদ রহস্যবাদী প্রবৃত্তি, হাল (ভাবাবিষ্টাবস্থা) সন্ন্যাসজীবন, একান্ত

বাস ইত্যাদিকে গুরুত্ব দেয়, মৌল ইসলাম তা দেয় না।

৪। শরিয়ত সম্পূর্ণ কোরান -হাদিস নির্ভর, যা নিয়ে মতভেদ প্রচুর। তা সত্ত্বেও, কোরানে মক্কীসূরা যতটা উদার মদনীসূরা ততটাই অনুদার, প্রতিহিংসাপরায়ণ। মৌল ইসলাম অন্যধর্মের প্রতি অনুদার, কিন্তু সুফিবাদ উদার। সুফিরা 'জিহাদ' এর অর্থ ধর্মযুদ্ধ বা বিধর্মী হত্যার প্রচলিত ধারা ত্যাগ করে জিহাদের অর্থ হৃদয়ের কুচিন্তা, কুইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা - এই তত্ত্ব মেনে চলে। অর্থাৎ বড়ো জেহাদে তাঁদের আস্থা। মৌলবাদীদের আস্থা ছোটো জেহাদে।

৫। সুফিমতে গুরু শিষ্য পরম্পরাকে স্বীকার করা হয়। শরিয়ত নির্ভর ইসলাম তাকে অস্বীকার করে, বলে তা ইসলাম বিরোধী।

৬। পরমাত্মার স্বরূপ কী এই নিয়েও মতভেদ প্রচুর। সনাতনপন্থীরা মান্য করে ঈশ্বরের সর্বাতীত অসীমরূপকে। তারা কখনও মনে করে না আত্মা পরমাত্মাতে লীন হতে পারে। এ ভাবনা তাদের কাছে ঈশ্বরকে হেয় করা, তাঁর অসীমত্বকে অস্বীকার করার সমতুল। কিন্তু তস্যাফ তথা সুফিমতে মানুষ ঈশ্বরের দাস নয়, প্রেমী। দুইয়ের মধ্যে রাগাত্মক সম্বন্ধ সুফিবিচারের বৈশিষ্ট্য। তাই তারা ঈশ্বরের সাথে 'ফনা' (বিলীন) বা নির্বাণ হবার কথা বলে।

৭। মৌল ইসলামে ঈশ্বর নিরাকার, এমন কী কোনো প্রতীকই তার কাছে গ্রহণীয় নয়। সুফিবাদ ঈশ্বরের নিরাকার তত্ত্বে বিশ্বাসী হলেও পীরের দরগাহ ও নজরগাহে চাদর চড়ানো, ইটবাঁধা ইত্যাদি অসংখ্য প্রতীকী প্রথায় আস্থা রাখে।

৮। সুফিমতের বিভিন্ন ধারা-উপধারায় সংগীত, নৃত্য, ছবি আঁকা, প্রচলিত শুধু নয়, বরং ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসাবে গৃহীত। আজমীর শরিফে চিস্তি সম্প্রদায়ের নৃত্য, মিশর -ইরান থেকে

বাউল -ফকির পর্যন্ত বর্তমান সুফিগানের বর্ণময়তা , নক্সাবাদী থেকে পাটুয়া পর্যন্ত নক্সা ও পট আঁকার প্রাণময়তা চ্যালেঞ্জ জানায় শরিয়তকে। যেখানে এসব কিছু নিষিদ্ধ।

* * * * * *

ইসলামকে বুঝতে গেলে তার বিবিধতা, লোকজ নিজস্বতা বুঝতে হয়। প্রথমে এ সত্য যাঁরা বুঝতে চান না তাঁরা শরিয়ত পন্থী। দ্বিতীয় বর্গে অমুসলমান সন্দেহবাদীরা , যাঁরা প্রথম বর্গের সুরে সুর মিলিয়ে ইসলামকে একমুখী, বর্ণহীন, গন্ধহীন তথা জীবনহীন এক 'জোর জবরদস্তি' বলে প্রচার করেন। কেস স্টাডি হিসাবে এই বাংলার লৌকিক ইসলাম এর কথা উল্লেখ করা যায়, যা বাঙালির জীবনধারাকে প্রভাবিত করেছে।

আমরা জানি, প্রচারমুখী বেশির ভাগ ধর্মই নতুন দেশে নতুন পরিবেশে গিয়ে তার আদিরূপের আমূল পরিবর্তন না করেও বহিরঙ্গে ব্যাপকহারে পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়েছে, যা এক নতুন ঘরানা বা রূপ লাভ করে। হিন্দু ধর্ম যখন যাভা সুমাত্রা মালয় দেশে যায় তখন সেখানের রূপ লাভ করে। বলিদ্বীপের নারায়ণ, কৃষ্ণ, রাম, সীতা, লক্ষ্মী, রাধা দেখতেও সেই দেশের মানুষের মতো। তিব্বত থেকে জাপান সর্বত্র গৌতমবুদ্ধের মূর্তি তার আদি দেশ ভারতবর্ষের মতো নয়, বরং স্থানীয় মানুষের অবয়ব। মোঙ্গলয়েড ফেস। ইসলামে বিগ্রহের স্থান নেই, থাকলে আলজেরিয়া, সোমালিয়ার মুহম্মদ হয়তো কৃষ্ণবর্ণের হতো। প্রচারমূলক ধর্মগুলোর নতুন স্থানিক রূপগুলোকে লৌকিক বলা হয়। ইসলামের লৌকিক রূপ চিরদিনই বেদায়ৎ, যদি তা আল্লাহর তৌহিদ অর্থাৎ ঈশ্বরের এক এবং অদ্বিতীয়ত্ব বিষয়ক মতবাদের বিরুদ্ধে হয় তবে অবশ্যই শিরক বলে পরিচিত হয়। নতুন দেশের বেদায়ৎগুলোর সঙ্গে ইসলামের আদিরূপের বা

বিশ্বাসের সম্পর্ক নেই, নব মুসলিমদের আচার, রীতি-নীতি ও ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক-সামাজিক অনুষ্ঠান ভিন্ন। মৌল ইসলামের আচার অনুষ্ঠানের তুলনায় শিরকগুলি লোকজ বিশ্বাসের ও প্রথার সহিত বেশি সংশ্লিষ্ট।

আদিভূমি আরব থেকে ইসলাম ক্রমশ যখন পারস্যে গেছে তখন সেখানের লৌকিক রূপ আয়ত্ত করেছে। বিভিন্ন দেশে, জনপদে, কৌমে তার রূপ বিভিন্ন হতে থেকেছে। তাই বাংলার বা ভারতের লৌকিক ইসলামের রূপ পারস্য বা মালয় উপদ্বীপের লৌকিক রূপের থেকে আলাদা, তবে এখানে পারস্যের লৌকিক প্রভাব কিছু দেখা যায়। কারণটা ঐতিহাসিক। এদেশে পারসিক সংস্কৃতির মাধ্যমেই সুফী মধ্যস্থতায় তুর্কি-পাঠান-মোঘলদের দ্বারা ইসলাম প্রচার ও প্রসারলাভ করে। তাই-ই পিরবাদ। আবার এখানের মাটিতে প্রাচীন ভারতীয় গুরু-শিষ্য পরম্পরার গ্রহণযোগ্যতা ছিলই, তাই পির মুরিদ সিলসিলার এতো জনপ্রিয়তা।

শরিয়তের বিপরীতে বা সমান্তরালে লৌকিক ইসলামের জনপ্রিয় ধারায় পিরবাদ এক বলিষ্ঠ ধর্মবিশ্বাস। বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান (৯৫%) এই মতবাদে বিশ্বাসী। এই অসম্ভব জনপ্রিয়তা এখনও শরিয়তপন্থী তথা সংস্কারপন্থী (এক্ষেত্রে সংস্কারের অর্থ স্থানীয় সংস্কারমুক্ত, ঐতিহ্যমুক্ত, Back to the Koran) ওয়াহাবি আন্দোলন আদি তাবড় শক্তিকে ঠেকিয়ে রেখেছে।

মহম্মদ এনামুল হকের মতে বঙ্গে লৌকিক ইসলামের জনপ্রিয়তার একাধিক কারণ আছে। একথা সত্য ধর্মান্তরিত নব মুসলমানদের বংশপরম্পরায় লালিত আচরণ রাতারাতি পাল্টানো অসম্ভব। কয়েকশো বছর এখানে লোকজ ইসলাম তার বিভিন্নতা নিয়ে প্রতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। প্রধানত সুফি সংসর্গে ইসলাম এখানে প্রসারিত হওয়াতে পারসিক, তাজিক, মোঙ্গল, আফগান, তুর্কি ইত্যাদি আদি বৌদ্ধজাতি এবং পূর্ববঙ্গের বৌদ্ধ উপসর্গের প্রয়োগ দেখা যায়। এই বৌদ্ধজাতিরা ১১ ও ১২ শতকে ইসলাম গ্রহণ করে। তাদের আজন্ম প্রথাকে তারা বর্জন করেনি। সত্যিই যে পূর্ব বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ বাজেয়াপ্ত করা প্রায় অসম্ভব তার উদাহরণ মৌল ইসলাম নিজেই। মৌল ইসলাম স্বয়ং পৌত্তলিকতা

দোষে দুষ্ট। কাবায় একটি কালো পাথর (হরজর -ই - অস্ওয়াদ) রক্ষিত আছে, প্রাক-ইসলামি আরব্য প্রথায় যাকে চুম্বন করা হয়। মুহম্মদ পৌত্তলিকতার চরম নির্দশন এই পাথরটিকে শুধু রেখেই দেননি চুম্বন প্রথাও বজায় রাখেন। হজ গমনকারী লক্ষ কোটি মুসলমান যা চুম্বন করে। তেমনই 'কোরবাণী' বা 'বকরিদ' অর্থাৎ প্রাচীন পশুবলি প্রথা।

একইরকমভাবে প্রাচ্য মুসলমানরাও। ফারসি 'পির' শব্দ মূলতঃ বৌদ্ধদের 'থের' (অর্থাৎ সংস্কৃতে স্থবির) শব্দ থেকে এসেছে। প্রাচ্য বৌদ্ধদের চৈত্যপূজা নব্য মুসলমানদের 'পিরপূজা', 'গোরপূজা'র আদিরূপ। প্রাচীন বৌদ্ধদের থের সমাধি বিষয়ক আচার যেমন, ধূপধুনো জ্বালানো, চন্দন মাখানো, পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া ক্রমে পিরের কবরে লোবান জ্বালানো, গোলাপ জল ছিটানো, আতর মাখানো প্রভৃতিতে রূপান্তরিত হয়। মৌল মতে আতর, গোলাপ, লোবান আজ মুসলমানদের ব্যবহৃত বস্তু হলেও এক্ষেত্রে তার ব্যবহার অন-ইসলামিক।

মজার ব্যাপার হলো বাংলায় পিরের মাজার, দরগা, উরস মেলা, লোককাহিনী ঘিরে শরিয়তি ও মারফতি দুই ধারা দেখা যায়। মারফতি হলো শরিয়তির বিপরীত। হুগলিতে ফুরফুরা শরিফের নেতৃত্বে শরিয়তপন্থীরা সমস্ত সুফিগানগুলিকে শরিয়তে আনতে তৎপর। বীরভূমের সিউড়ির অনতিদূরে পাথরচাপরিতে দাতা বাবার মাজার, সেখানে উরস মেলায় হিন্দু মুসলমান বাউল ফকির অংশগ্রহণ করে। মারফতি প্রথা চলে এখানে। এখানেও তৌহিদ পন্থীদের মিছিল ও আস্ফালনের কথা শোনা যায়। রাঢ় বাংলায় বাউল ফকিরদের উপর আক্রমণের মাত্রা বাড়ছে প্রতিদিন। বাউলরা বলে দৈহিক কসরৎমাত্র। চারদেওয়ালের ভিতর ঈশ্বরের স্মরণকে মানে না। কাবার কালো পাথর ও কামরূপের কথিত যোনিপাথরকে এক পংক্তিতে বসায়। বাউল ধ্বংসের ফতোয়ায় প্রধান অভিযোগ হলো যোনি সেজদা।

বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিভিন্ন পির-পিরণির থানভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ও পাঁচালি পাঠ থেকে লৌকিক ইসলামের এক নিটোল, অসাম্প্রদায়িক, জনপ্রিয় ও ভূমিজরূপ

দেখা যায়। যা থেকে বোঝা যায় মৌল ইসলাম থেকে তা কতটা কীরকম, কিভাবে ভিন্ন ও বিদ্রোহী । যেমন—

ক) পির সদু ও সোনাগাজী - এই দুই পিরকে গণিকা পির বলা হয়। শুধু বাংলায় নয় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও পির সদু যৌনকর্মীদের দ্বারা পূজিত হয়। কলকাতার সোনাগাছিতে পির সোনাগাজির কবর আছে। এখানে হিন্দু মুসলমান সব যৌনকর্মীরা তাঁর ভক্ত। বৌবাজার হাড়কাটা গলির মুখেও এক পিরের কবর আছে। এখানের যৌনকর্মীরা কবরে সিন্নি দেয়, পূজা করে।

খ) পির মা চন্ডালি সইফ - দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার গঙ্গাসাগরের কাছে এই পীরের কবর আছে। এনাকে 'নৌ পির' বলা যেতে পারে। কেননা স্থানীয় মাঝি-মাল্লাদের বিশ্বাস চড়ায় নৌকা আটকে গেলে বা সমুদ্রে নৌকা হারিয়ে গেলে এই পির এসে উদ্ধার করেন।

গ) সত্যপির - বাংলার হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে অসম্ভব জনপ্রিয় সত্যপির বা সত্যনারায়ণ। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে পারস্যের সুফিসাধক মনসুর ইল্লাজ হলেন মূল সত্যপির। মনসুর ইল্লাজকে 'অন-অল-হক' (আমিই সত্য) উচ্চারণের জন্য মৃত্যু দন্ডে দন্ডিত করা হয়। বলা হয় একথা শরিয়ত বিরোধী। 'হক' আরবী শব্দ, বাংলায় যার অর্থ সত্য।

ঘ) মানিক পির - গ্রিক শব্দ 'মানিকি' থেকে মানিক পীর শব্দের উৎপত্তি। প্রাক ইসলাম যুগের পারস্যেদেশে মানিক পির-এর কথা শোনা যায়। গবাদী পশু রক্ষায় যার উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলায় 'মুশকিল' আসান করো দয়াল মানিক পির' ফকিরদের মুখ থেকে শোনা এক লোকপ্রিয় গান ও কথা। গাইয়ের প্রথম দুধ, ফলন্ত গাছের প্রথম ফল এই পিরকে দেওয়া হয়, গবাদি পশুর রোগ নিরাময়ের আশায়।

গ্রন্থসূত্র

১. Sufism
IT'S SAINTS AND SHRINES
John A. Subhan
Samuel Weiser INC, New York, 1970

২. Tadhkirat - Ul- Auliya
Nicholson

৩. Studies in Islamic Mystism
Nicholson

৪. Outlines of Islamic culture
Sustori

৫. বাংলার পীর সাহিত্যের কথা
ডা. গিরীন্দ্রনাথ দাস
শেহিদ লাইব্রেরি, কলকাতা

৬. বস্তুবাদী বাউল
শক্তিনাথ ঝা
লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী কেন্দ্র, কলকাতা

৭. রচনাবলী
মুহম্মদ এনামুল হক
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

উনিশ শতকের তিন ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব

বুলবুল আহমেদ

"There is no real connection between religion and the laws, social, civil and political under which a community lives. Religious truths transcend the powers of human understanding, while laws being Phenomenal relations are amendable to experience."

Delwar Hossain Ahmed (1840 - 1913)

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বাঙালি মানসে এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। আর একে সাধারণত বাংলার রেনেসাঁস নামে অভিহিত করা হয়। এই আন্দোলনের অনেক সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়েও বলা যায়, প্রায় ঔপনিবেশিক আমলের বাংলার মধ্যযুগীয় স্বৈরাচার ও সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থা থেকে মুক্তি ঘটিয়ে আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উন্মেষ ইংরেজ শাসনের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছিল। সামন্ততান্ত্রিক সমাজকাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ থাকায় তার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়নি। আবার বলা হয়, মুসলমান সমাজের কোনো অংশই এই বিরাট সামাজিক আন্দোলনে নিজেদের জড়িত করেনি। অথচ আধুনিক গবেষণায় অনেক ব্যতিক্রমী মুসলমান ব্যক্তিত্বের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে। আর আমরা তো জানি, তারা মুক্ত-ভাবনার কথা বলেছেন, অতীত সংস্কার ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছেন। যুগমানসের অনড়তার কারণেই তাঁদের প্রগতিশীল ও ব্যতিক্রমী চিন্তাভাবনা সমূহ এবং সমাজ রূপান্তরের ক্ষেত্রে তাঁদের অবদানের কথা বেরিয়ে আসে এক সময় কালের ধুলো সরিয়ে দিয়ে।

সাম্প্রতিক গবেষণায় এমন কয়েকজন মুসলমান যুক্তিবাদী চিন্তাবিদের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, যাঁরা উনিশ শতকের প্রেক্ষিতে বিস্ময়কর ব্যক্তিক্রমধর্মী ব্যক্তিত্ব। আব্দুর রহীম দাহরী (১৭৮৫-১৮৫৬), ওবায়দুল্লাহ-আল-ওবায়দী

(১৮৩৪-১৮৮৫), দেলওয়ার হোসেন আহমেদ(১৮৪০-১৯১৩) প্রমুখের নাম তাঁদের মধ্যে সবার আগে উচ্চারিত হবে। মনে রাখতে হবে, ইসলামি ধর্মবিশ্বাস আপাতভাবে অনমনীয় ধরা হলেও মুসলিম ভাব জগতে যুক্তিবাদের একটা স্থান ছিলই। প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় নবম শতকের আরবের মুতাজিলা মতবাদের চর্চার মধ্যে। ধর্মবিশ্বাসকে কীভাবে যুক্তির মাধ্যমে অন্বিত করা যায় তার অনুসন্ধানই ছিল তাঁদের মূল লক্ষ্য। মুতাজিলা দার্শনিকেরা প্রাচীন গ্রিক যুক্তিবাদী দর্শন গভীর ভাবে অধ্যয়ন করেন ও প্রভাবিত হন এবং মুসলিম মনোজাগতিক ঐতিহ্যে এর একটা বিশিষ্ট স্থান সবসময় রয়ে গেছে।

দাহরী শব্দটির অর্থ নাস্তিক বা প্রকৃতিবাদী বা বস্তুবাদী। উনিশ শতকের সূচনায় পশ্চাদপদ মুসলিম সমাজে আব্দুর রহীম দাহরীর মতো একজন আধুনিক চেতনা সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রকাশ সত্যিই বিস্ময়কর। অযোধ্যার গোরখপুরে আব্দুর রহীম জন্মেছিলেন। তাঁর পিতা মোসাহেব আলী ছিলেন একজন তাঁতি কিন্তু ফারসি ভাষার প্রতি ছিল গভীর আগ্রহ। আব্দুর রহীম ঐতিহ্যবাহী ইসলামি শিক্ষার পাশাপাশি ফারসি, আরবি, তুর্কি, পুশতু, ইংরেজি, ল্যাটিন ও গ্রিক ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। ১৮০৪ সালে তিনি উচ্চশিক্ষার্থে লক্ষ্ণৌতে আসেন এবং এক বছর সেখানে অবস্থান করেন। লক্ষ্ণৌতেই ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মনে সংশয় দেখা দেয়। তারপর তিনি দিল্লি যান। ১৮০৫-১৮০৮ এই তিন বছর তিনি সেখানে বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। এখানে তাঁর অন্যতম সহপাঠী ছিলেন ওহাবী আন্দোলনের নেতা সৈয়দ আহমদ রায়বেরিলি। ১৮০৮ সালে তিনি এলফিনস্টোন ও ফ্রেজারের সাথে আফগানিস্তানে গিয়ে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ পাঠ করেন। এই সময়ে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের সংস্পর্শ তাঁকে ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে। তারপর ফ্রেজারের পরামর্শে তিনি শিক্ষার ও মুক্তচিন্তার পীঠস্থান কলকাতায় আসেন ১৮১০ সালে এবং আমৃত্যু এখানেই তিনি বিভিন্ন বিষয়ে চর্চা করেন।

রামমোহন রায়ের চার বছর আগে আব্দুল রহীম কলকাতায় আসেন। তাঁদের

মধ্যে যোগাযোগের বিষয়ে কিছু জানা যায় না। তিনি শুধু রামমোহনের সমসাময়িকই ছিলেন না, ছিলেন তাঁর মুসলিম সহযাত্রী এবং বিশ্বাস করতেন আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাই জাগতিক উন্নতির একমাত্র চাবিকাঠি। আধুনিক বিজ্ঞান, দর্শন ও ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে তিনি পুস্তক রচনা করেন। ইংরেজি ভাষা থেকে বিজ্ঞান ও দর্শনের অনেক রচনা তিনি আরবি ও ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনিও ইংরেজির মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের দাবি জানিয়ে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসকে চিঠি দিয়েছিলেন; যেমনটি করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি জানতেন কেবল অনুবাদের মাধ্যমে নতুন জ্ঞানের প্রকৃত প্রসার সম্ভব নয়। কয়েক বছর তিনি টিপু সুলতানের পুত্র সুলতান মুহম্মদ শুকুরুল্লাহর গৃহ-শিক্ষকতা করেন এবং সে সময়ে টালিগঞ্জে বসবাস করতেন। আধুনিক বিজ্ঞান দর্শন, সাহিত্য ও রাজনীতির সংস্পর্শে তাঁর রূপান্তর সম্পূর্ণ হয় এবং তিনি বিভিন্ন ধর্মের সত্যাসত্য ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত হন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মবেত্তা ও মুসলিমদের নানা মতবিরোধ লক্ষ করে তিনি ধর্মের সংস্রব ত্যাগ করেন। প্রথম জীবনে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত একজন ব্যক্তির এই রকম আধুনিক যুক্তিবাদীতে রূপান্তর সত্যিই ব্যতিক্রমী ঘটনা। জানা যায়, আব্দুর রহীমকে পুনরায় ইসলামের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য এক সময়ের সহপাঠী সৈয়দ আহমেদ রায়বেরিলি কলকাতায় এলেও রহীম তাঁর সাথে দেখা করেন নি। মওলানা আবুল কালাম আজাদের মন্তব্য থেকে জানা যায়, তখনকার আলেস সম্প্রদায় তাঁকে অবজ্ঞা করে দাহরী বা নাস্তিক বলে সম্বোধন করতেন। আর তিনি মনে করতেন ইসলামের নীতি ও বিধানগুলিকে যুক্তি ও বিশ্বাসের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করার সময় এসেছে। কেবল আল্লাহর আদেশ বলে মানুষ তা পালন করবে, সে যুগ আর নেই।

'দাহরী' বাঙালি ছিলেন না। তিনি অনেক ভাষা জানলেও বাংলা জানতেন কিনা, জানা যায় না। সেকালে শিক্ষিত অভিজাত মুসলমানরা বাংলা ভাষাকে সুনজরে দেখতেন না: তিনি বাংলায় কিছু লেখেননি, নিঃসন্দেহ। দাহরী ১৮১৩-১৮১৪ সালে কিছুকাল ঢাকায় অবস্থান করেন ও সাহিত্যচর্চা করেন।

বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষায় তাঁর দখল না থাকায় স্থানীয় মুসলমান জনগণের সাথে তাঁর যোগাযোগ হয়নি। এবং আব্দুর রহীম দাহরী স্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে রামমোহনের মতো আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেননি। ধর্ম বিষয়ে দাহরীর যুক্তিবাদ রামমোহনের থেকে অনেক বেশি অগ্রবর্তী ছিল। স্ব-সম্প্রদায়ের বাঙালিদের অন্তর স্পর্শ করতে পারেননি দাহরী, যাঁদের সাথে তাঁর ভাষাগত আদান প্রদান চলত সেই মুসলমানদের মনোভাব তাঁর মতো একজন নাস্তিকের প্রতি কেমন হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। তাঁর অনুগামী ওবায়দুল্লাহ-র আত্মকথা থেকে জানা যায়, আধুনিক যুক্তিবাদের প্রতি অগাধ বিশ্বাসের কারণে স্ব-শ্রেণি ও স্ব-ভাষী গোঁড়া ও রক্ষণশীল আলেম সমাজের কাছেও গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিলেন দাহরী। তিনি ছিলেন চিরকুমার এবং নিতান্তই একা, নিঃসঙ্গ। জানা যায় টিপু সুলতানের পরিবারের গৃহশিক্ষকতা ছেড়ে তালজানা নামক খোলা মাঠে একটি তাঁবুর মধ্যে পরবর্তী জীবন অধ্যয়নে কাটান। সামাজিক প্রত্যাখ্যান নাকি সমাজের প্রতি তাঁর অভিমান? পরে যুক্তিবাদী ও অভিমানী বিদ্যাসাগরকেও আমরা কার্মাটারে সাঁওতালদের মধ্যে বাস করতে দেখি।

দেখা যাচ্ছে, পরবর্তী সময়ে ওহাবীদের উগ্রধর্মোন্মদনা ও অসহিষ্ণুতা মুসলিম সমাজে যুক্তিবাদ ও আধুনিকতা প্রসারের একটি সুন্দর সম্ভাবনা নষ্ট করে দেয়। যেমন নষ্ট হয়ে ছিল নবম শতাব্দীর প্রাচীন গ্রিক যুক্তিবাদে বিশ্বাসী আরবের মুতাজিলা আন্দোলন। মুসলমান সমাজে সুস্থ মানবতাবাদী, ইহজাগতিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা প্রসূত আন্দোলনগুলি এমনি করেই বার বার সমকালীন অগ্রসরমান জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কহীন ধর্মান্ধ আলেম সম্প্রদায়ের আক্রমণে নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু সব যুগেই আব্দুর রহীম দাহরীর মতো দু-একজন নিঃসঙ্গ, প্রতিবাদী তথা যুক্তিবাদী এবং ব্যতিক্রমী মানুষ থাকেন, মানব সমাজকে চিন্তাচর্চায় এগিয়ে নিয়ে যান।

আব্দুর রহীম দাহরী রচিত গ্রন্থের একটি তালিকা আমরা দেখে নিতে পারি:

ক. ফারহাঙ্গী দাবিস্তান : ফারসি ব্যাকরণের ওপর একটি বই।

খ. পান্দানাম-ই-বাহরাম : যুক্তিবিদ্যা বিষয়ক ফারসি পুস্তক। ১৮৬০ সালে তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়।

গ. তওয়ারিখে হিন্দুস্তান : J.C. Marshman রচিত History of India -এর ফারসি অনুবাদ।

ঘ. কারনাম-এ-হায়দারী : এটি হায়দর আলী ও টিপু সুলতানের জীবন ও কর্মকান্ডের ওপর রচিত ঐতিহাসিক বই। ১৮৪৮ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

ঙ. মাশরিকুল আনওয়ার : জন গ্রে রচিত রূপকথার ইংরেজি বইয়ের ফারসি তর্জমা।

চ. হিকায়ত-ই-ইবরাত আয়ত: লোকমান হাকিমের গল্পের ওপর ইংরেজি বইয়ের ফারসি অনুবাদ।

ছ. Aesop's Fable -এর একটি অনুবাদ করেন এবং ১৮৩০ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

জ. ফাতিহাতুল তারজমাহ :Encyclopaedia Britannica থেকে বীজ গণিতের ওপর প্রবন্ধাদির আরবি ভাষায় অনুবাদ।

ঝ. আল আনওয়াবুল মাশরিকিয়াহ : যুক্তিবিদ্যার বই। জ্ঞানের উৎসমূল ও মানুষের বাকশক্তির উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা।

ঞ. যারী শাকিল : আধুনিক বলবিদ্যার নিয়ম ও তত্ত্বসম্পর্কিত একটি পুস্তিকা।

ট. জাবর ওয়া মুকাবালাহ : Bridge রচিত বীজগণিতের আরবি অনুবাদ।

ঠ. মুনাযারা -ই - চশম ওগাশ : তর্কশাস্ত্রীয় পুস্তক।

ড. শিগরাফ-বায়ান-ইবরাত তাওয়ান : আব্দুর রহীমের সবচেয়ে মূল্যবান বই

আত্মজীবনীমূলক রচনা। লেখক তাঁর চিন্তার বিবর্তনের কাহিনী বর্ণনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন কীভাবে তিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান থেকে কালক্রমে একজন সংশয়বাদীতে পরিণত হয়েছিলেন। তাছাড়া দর্শন বিষয়ক আলোচনা করেছেন। এই বইয়ের দ্বিতীয় অংশের নাম 'আকসানা -ই-দেরীনে-রোজগার নামজাদ নাম এ নীগাব এবং এখানে লেখকের ৩৮ বছর বয়স পর্যন্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

ঢ. তামান্না : প্রথম বয়সে রচিত ফারসি কবিতার সংকলন।

২.

আব্দুর রহীমের প্রিয় ছাত্রদের মধ্যে প্রখ্যাততম হলেন শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও পন্ডিত ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী। ওবায়দুল্লাহর স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায় যে, তিনি মহান শিক্ষক দাহরীর কাছে থেকে দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ে পাঠ গ্রহণ করেন। আব্দুর রহীম দাহরীর মুক্তচিন্তা ও যুক্তিবাদ ওবায়দুল্লাহকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট নেতা রাজনারায়ণ বসু ছিলেন ওবায়দুল্লাহের বন্ধু। তাঁরই অনুরোধে ওবায়দুল্লাহ রাজা রামমোহন রায়ের ধর্মতত্ত্বের ওপর বিখ্যাত বই 'তুলফাতুল মুওয়াহ্হীদীন' যেটি আরবি ভূমিকাসহ ফারসি ভাষায় রচিত হয়েছিল, তার ইংরেজি অনুবাদ করেন। নাম দেওয়া হয় *Tunfatul Muwahhiddin or A Gift to Deists*. আমরা জানি Deist এর অর্থ হলো প্রচলিত কোনো ধর্মমতে বিশ্বাসী না হয়েও কেবলমাত্র যুক্তির আলোকে একক ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস। এই গ্রন্থে রামমোহন কেবল হিন্দুদের প্রচলিত পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেই ক্ষান্ত হননি, মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস ও অতিপ্রাকৃত শক্তির অস্তিত্ব সম্পর্কেও সংশয় প্রকাশ করেন। ওবায়দুল্লাহ রামমোহনের একটি সপ্রতিভ বক্তব্যের ইংরেজি তরজমা করেন এইভাবে : falsehood is common to all religions without distinction . আমরা এখানে ওবায়দুল্লাহ ও তাঁর শিক্ষক আব্দুল রহীমের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

৪

১৯শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার মুসলিম সমাজ চিন্তায় এক নয়া যুক্তিবাদী মনের আবির্ভাব দেখা যায় এবং এই ধারার প্রধান প্রবক্তা ছিলেন দেলওয়ার হোসেন আহমেদ। তাঁর জন্ম হয়েছিল হুগলিতে ও শিক্ষাজীবন শুরু হয় কলকাতা মাদ্রাসায়। ইংরেজি ভাষায় তিনি বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৬১ সালে প্রথম বিভাগে বি.এ. পাশ করেন। সম্ভবত এই উপমহাদেশে তিনিই প্রথম মুসলমান গ্রাজুয়েট। দেলওয়ার হোসেনের চিন্তাধারায় যৌক্তিকতা ও সাহসিকতা ধর্মীয় অনুশাসনের ও বিধিনিষেধের আমূল পরিবর্তন দাবি করেছিলেন। সমকালীন ইউরোপের যুক্তিবাদী দর্শন দেলওয়ার হোসেনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনি মুসলমানদের অবনতির কারণ সমূহ তাদের অতীত ইতিহাস , ধর্মীয় অনুশাসন ও সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে অনুসন্ধানের কথা বলেন। তাঁর চিন্তাধারার সাথে সমকালীন অপর দুই মুসলমান চিন্তাবিদ নবাব আব্দুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলীর চিন্তাধারার বিস্তর পার্থক্য ছিল। আব্দুল লতিফ বাস্তব প্রয়োজনে মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের কথা বলেন। কিন্তু সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে ছিলেন ঘোর রক্ষণশীল। আমীর আলী মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা তুলে দিয়ে মুসলমানদের জন্য ইংরেজি মাধ্যমে সম্পূর্ণ আধুনিক ও কারিগরি বিদ্যাশিক্ষার সুপারিশ করেন। আমীর আলী উনবিংশ শতকের যুক্তিবাদের আলোকে ইসলামের ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করেছেন। কিন্তু সমাজের অগ্রগতির জন্য ইসলামের কোন কোন অনুশাসন পরিবর্তন বা বর্জন করা বিধেয় তা আমীর আলী পরিষ্কার করে বলেন নি।

অন্য দিকে দেলওয়ার হোসেনের চিন্তা ছিল স্বচ্ছ, বস্তুনিষ্ঠ এবং বৈপ্লবিক। তিনি নিজেকে মুতাজিলা পন্থীদের উত্তরসুরি বলে মনে করতেন। তিনিই খুব সম্ভবত প্রথম আধুনিক মুসলিম চিন্তাবিদ যিনি ইসলামের কিছু অনুশাসন ও বিধি যা ধ্রুববিশ্বাসের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়, সেগুলো যুগের প্রয়োজনে পরিবর্তন, এমনকি বর্জনের কথা বলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, পরিবর্তনশীল

সমাজের চাহিদা স্থিতিশীল ধর্মীয় অনুশাসন দিয়ে মেটানো সম্ভব নয়। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন নি। আর মাদ্রাসাগুলোতে যে ধরনের শিক্ষা দেওয়া হয় সেটা তাঁর ভাষায় : utterly unsuited to the times and it was a mere waste of means to supply people with what has no present value and will be of no future use. তিনি কলকাতা ও হুগলি মাদ্রাসা তুলে দিয়ে মুসলমানদের জন্য আধুনিক শিক্ষার ইংরেজি স্কুল স্থাপনের সুপারিশ করেন। দেলওয়ার হোসেনের মতে বাংলা ভাষার প্রতি মুসলিম অভিজাত শ্রেণির অবজ্ঞা ও ইংরেজি ভাষা শিখতে মুসলমান জনসাধারণের অনীহা বাংলার মুসলমানদের অনগ্রসরতার মূল কারণ। বাংলার মুসলমানদের বাংলা শেখা অপরিহার্য এ-কথা জোর দিয়ে বলেছেন। তিনি সুপারিশ করেন দর্শন, বিজ্ঞান ও মানববিদ্যা বিষয়ক ইংরেজি গ্রন্থগুলো বাংলা ভাষায় অনুবাদের এবং সে দায়িত্ব নিতে হবে, এ দেশেরই ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিদের।

দেলওয়ার হোসেন বহুবিবাহ এবং পর্দাপ্রথা বিলুপ্ত করার আহ্বান জানান, মুসলমান সমাজের কল্যাণের জন্য। তিনি মুসলিম পারিবারিক আইন ও ধনবন্টন ব্যবস্থা আধুনিক চাহিদা অনুযায়ী সংশোধন করার পক্ষপাতী ছিলেন। ঋণের ওপর সুদ দেবার বিরুদ্ধে ইসলামি বিধিনিষেধ সমর্থন করেননি। তিনি মনে করতেন এর ফলে মুসলমান সমাজে পুঁজির বিকাশ ব্যাহত হতে বাধ্য। দেলওয়ার হোসেনের চিন্তাধারা সমকালের মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ রেখাপাত করতে পারে নি। তাঁর অধিকাংশ লেখাই ইংরেজিতে বলে বাংলার সাধারণ মানুষ তাঁর মতামতের সাথে আজও পরিচিত হতে পারেননি। আজকের দিনেও যে কোনো সমাজেই কজন জোর গলায় বলতে পারেন, যেমন দেলওয়ার হোসেন বলেছিলেন : 'It is the duty of every man of intelligence and knowledge to seek truth, and when he finds it, it is his duty to proclaim it.'

উনিশ শতকের বাংলার সমাজচিন্তাকে কোনো একটি বিশেষ ধারা দিয়ে

চিহ্নিত করা যায় না। চিন্তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারা সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত হয়ে আমাদের মানসভুবন ও সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রভাবিত করেছে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন, চিন্তার ক্ষেত্রেও তেমনি কোনো কথাই শেষ কথা হতে পারে না। আর আমরা তো জানি, একটা সমাজ কতখানি উন্নত ও সভ্য সেটা নির্ধারণ করা যায় সেই সমাজে ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার ও স্বাধীনতা কতটা রয়েছে তার মাধ্যমে। আব্দুর রহীম, রামমোহন রায়, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, দেলওয়ার হোসেন — এঁরা সকলেই সেকালের ব্যতিক্রমধর্মী মহান পুরুষ। সমকালের সমাজে এঁরা কেউ-ই জনপ্রিয় ছিলেন না। তাঁরা সকলে প্রচলিত মত ও প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস দেখিয়েছেন। সমকাল তাঁদের গ্রহণ না করলেও হয়তো নবাগত সময় তাঁদের সমাজের শ্রেষ্ঠ আসনে বসাবে। সভ্যতার ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

কৃতজ্ঞতা

১. ইতিহাসের সন্ধানে : সাগাহউদ্দীন আহমদ

২. মুসলিম মানস ও বংলা সাহিত্য : আনিসুজ্জামান

৩. মাসিক চতুরঙ্গ : বর্ষ ৫৩ সংখ্যা ৯ জানয়ারি, ১৯৯৩

৪. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ : শিবনাথ শাস্ত্রী

উচ্ছেদবিরোধী সংগ্রাম, বহুজন আন্দোলনের আর এক ধারা

অর্ক সেনগুপ্ত

গত ৫-৬ বছর ধরে উন্নয়ন ও উচ্ছেদ শব্দ দুটি নিয়ে বিস্তর আলোচনা, জলঘোলা হয়েছে। উত্তর আধুনিকরা উচ্ছেদকে বলেছেন উন্নয়নের ' বাই প্রোডাক্ট' , আর শাসকের ভাষায় তা হয়েছে ' কোল্যাটারাল ড্যামেজ'। সে কথা থাক, কিন্তু উচ্ছেদ শব্দটি উন্নয়নকে বাদ দিয়েও এসেছে আগে। সে কথাতে একটু পরে আসছি। উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সারা দেশেই গণসংগ্রাম মাথা তুলেছে অনেক বছর ধরেই। সেই সংগ্রামে প্রগতিশীল-গণতান্ত্রিক-মানবতাবাদী দেশবাসীরা সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েও চলেছেন। 'এই উচ্ছেদবিরোধী সংগ্রাম আসলে শ্রেণী সংগ্রাম', এ ধরনের নানা বক্তব্য বারবার আলোচিত হলেও যেটা খুব একটা আলোচিত হয় নি (বা হলেও এতই কম যে চোখে পড়েনি), তা হলো, বারবার দলিত সংখ্যালঘু মানুষই উচ্ছেদের শিকার হয়েছে কেন ? চলমান উচ্ছেদবিরোধী সংগ্রাম শ্রেণী সংগ্রামের অংশ কিনা তা নিয়ে আলোচনা করা ও মতামত পেশ করাও যেমন দরকার, তেমনই দরকার হল দলিত ও সংখ্যালঘু মানুষদের অধিকার অর্জনের লড়াইয়ের একটা ধারা হিসেবেও উচ্ছেদবিরোধী সংগ্রামকে দেখা। তাতে হয়ত শ্রেণী সংগ্রামও উপকৃতই হবে। কারণ শোষক শক্তিগুলি যখন জোটবদ্ধ তখন শোষিতদের জোটবদ্ধ করার জন্য চূড়ান্ত নমনীয়তা দেখানোটাই বোধহয় 'মূর্ত অবস্থার মূর্ত বিশ্লেষণ'।

আসুন, এবার ফিরে তাকিয়ে দেখা যাক যে সত্যি দলিত ও সংখ্যালঘুরাই বারবার উচ্ছেদের শিকার কিনা। ভিটেমাটি জীবিকা সংস্কৃতি থেকে প্রথম যে বড় উচ্ছেদ, তা ছিল দেশভাগ। উচ্ছেদের কারণ নিয়ে আলোচনা করার জন্য এ লেখা নয়, আমি শুধু তুলে ধরতে চাইছি উচ্ছেদ কারা হচ্ছে, সেই অনুসন্ধান। যাই হোক দেশভাগের ফলে এক বিশাল সংখ্যক মানুষকে ওপার থেকে এপার চলে আসতে হয়। পাঞ্জাবে এই উচ্ছেদের শিকার হন সংখ্যালঘু শিখরা মূলত। আর বাংলায় নিম্ন বর্ণ হিন্দু দলিতরা। কিছু বর্ণহিন্দু পাঞ্জাবি ও বাঙালিও সে সময় আসেন এ কথা সত্য। কিন্তু তারা কেউই উচ্ছেদ হয়ে আসেন নি। বরং

ক্ষমতার কাছাকাছি থাকায় তারা পরিস্থিতি সম্বন্ধে বুঝতে পেরে আগেই জমি-জমা বেচে কেটে পড়েছিলেন। আর এধারে এসেও তারা সাময়িক অসুবিধায় পড়লেও নাগরিকত্বটি পেয়েছিলেন। কিন্তু দলিত উচ্ছেদ হওয়া মানুষগুলির অনেকেরই নাগরিকত্ব আজও মেলেনি। বলাই বাহুল্য ৪৭-এর দেশভাগ ছিল উচ্ছেদের শুরু। সে প্রক্রিয়াটি তারও পরে বহু বছর ধরে চলেছে। উচ্ছেদ হয়ে আসা দলিতদের জন্য প্রথমে ক্যাম্প ও পরে আন্দামান দন্ডকারণ্য। সেই ক্যাম্পে বা পরে আন্দামান, দন্ডকারণ্যে বর্ণহিন্দু ছিলেন কত সংখ্যক?

পূর্ববঙ্গ (অধুনা বাংলাদেশ) থেকে উচ্ছেদ হওয়া দলিত মানুষদের এপারে এসে নানারকম উচ্ছেদের সামনে দাঁড়াতে হয়। ক্যাম্প থেকে আন্দামান, দন্ডকারণ্য। যাঁরা দন্ডকারণ্যে যান নি তাঁদের সবরকম সরকারী সাহায্য বন্ধ করে দেওয়ার ফলে রুটি রুজির সন্ধানে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছুটে বেড়ানো। তবে সবচেয়ে অমানবিক উচ্ছেদের শিকার তাঁরা আবার হন মরিচঝাঁপিতে। সুন্দরবনের মরিচঝাঁপি অঞ্চলের বিপদসঙ্কুল অরণ্যে তাঁরা প্রায় শহরই গড়ে তুলেছিল কোনো সাহায্য বাদ দিয়ে শুধু মাত্র নিজেদের শ্রমে, ৭০ দশকের শেষ দিকেই। সেখানে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালানো হয়, এক পরিকল্পিত নৃশংস গণহত্যা, অমানবিক উচ্ছেদের জন্য। দেশভাগের সময়ে তবু উচ্চবর্ণের শোষণে ধর্মান্তরিতদের সাথে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের ফলে উচ্ছেদ হতে হয়, আর এবার বর্ণহিন্দু পরিচালিত রাষ্ট্রই উচ্ছেদ করে স্বধর্মের তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষদের প্রচন্ড অমানবিকভাবে ও এক নিষ্ঠুর গণহত্যার মাধ্যমে। একবার তাকানো যাক বাকি দেশটার দিকে। প্রথম সবুজ বিপ্লবের ফলে কালাহান্ডি হয়ে ওঠে বধ্যভূমি, বিদর্ভের ক্ষেত হয়ে ওঠে মারণ ক্ষেত। কালাহান্ডিতে অনাহার -অপুষ্টিতে মৃত ও বিদর্ভে প্রতি আধঘণ্টায় আত্মহত্যারত ২ জন কৃষকের কতজন বর্ণহিন্দু? ৯৫ শতাংশ তারা দলিত, কিছু সংখ্যালঘুও। এই অবস্থাও জন্ম দিয়েছে এক পরোক্ষ উচ্ছেদের। যার ফলে কাতারে কাতারে দলিত-সংখ্যালঘু মানুষ জীবিকার সন্ধানে পাড়ি দিয়েছেন শিল্প-নগরগুলির দিকে নিজেদের শিকড় উপড়ে। শিল্পে অসংগঠিত ক্ষেত্রে সিংহভাগ মানুষই তাই দলিত-সংখ্যালঘু, কোলকাতার রাস্তায় যে ভিখিরিরা ঘুরে বেড়ায়, তাদের সাথেই কথা বলে

জানুন না, দেখুন না কতজন বর্ণহিন্দুকে খুঁজে পাবেন? শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পেই দেখা যায় উচ্চবর্ণের জমিদারদের শোষণে সংখ্যালঘুর চলমান উচ্ছেদের ইতিহাস, যা আজও চলছে। আজও ব্যাঙ্কের দেনা না শোধ দিতে পেরে জমি হারিয়ে, সুদখোর মহাজনদের কাছে জমি হারিয়ে যে কৃষকেরা শহরে এসে হয় কারখানায়, নির্মাণ শিল্পে ঢুকছে, বা বেকার বাহিনীতে নাম লেখাচ্ছে তারা অধিকাংশই দলিত-সংখ্যালঘু। এই উচ্ছেদ চলমান। সভ্যতার ইতিহাসে এ উচ্ছেদ নতুন কিছু নয়, একথাই হয়তো বলবেন মার্কসবাদী মহল। **কিন্তু এ দেশে এই উচ্ছেদের সাথে যুক্ত জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার বিষয়টিকে খেয়াল করলে জাতি-বর্ণ ব্যবস্থা বিরোধী সংগ্রামটিকেই যে শ্রেণী সংগ্রামের অংশ ও অবশ্য করণীয় কর্তব্য বলে ভাবতে হবে সেটা বোধহয় তথাকথিত শ্রেণী সংগ্রামের 'একমাত্র' প্রবক্তারা বোঝেন না। কিন্তু, তাঁদেরও বোঝাটা দরকার, কারণ উচ্ছেদ হওয়া কৃষক শ্রমিকে পরিণত হয়েও তার জাতি-বর্ণগত পরিচয়টিকে অটুট রাখেন ব্রাহ্মণবাদী শাসন কৌশলের ধূর্তামির জন্য। এবং সেই পরিচয়েই পরিচিত হন, তাঁদের শ্রেণী পরিচয়ে আত্মপরিচিতি দিয়ে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যও জাতি-বর্ণভেদ বিরোধী সংগ্রামটিকে অবশ্য বলে পালন করা উচিত।**

আসুন এবার আমরা অনেকটা এগিয়ে আসি বর্তমানের কাছাকাছি। ১৯৯৬ সাল, কোলকাতার বুকে হাতিবাগান, পড়িয়াহাট, বড়বাজারে অপারেশন সানসাইন, হকার উচ্ছেদ। জীবিকার ওপর এক মারাত্মক আক্রমণ। আক্রান্ত কারা? কারা হকার? সেই দলিতেরা - সংখ্যালঘুরা, যাঁরা বারবার উচ্ছেদ হওয়াকে অভ্যাসে পরিণত করেছেন ব্রাহ্মণ্যবাদী রাষ্ট্রের দয়ায়। গ্রামের থেকে উচ্ছেদ হয়ে জীবিকার সন্ধানে কোলকাতায় আসা মানুষ তাঁরা। এবারে আক্রমণ তাঁদের জীবিকার ওপরে। বাদ যায়নি গ্রাম থেকে উচ্ছেদ হয়ে কোলকাতায় আসা দলিত-সংখ্যালঘুদের বাসস্থানও। টালিনালা, খালপাড়, গোবিন্দপুর রেল কলোনির ওপর দিয়ে চলে গেছে উচ্ছেদের বুলডোজার। উচ্ছেদ হয়ে আসা দলিত-সংখ্যালঘুরা আবার হারিয়েছেন বাস্তুভিটে আবার শিকার হয়েছেন উচ্ছেদের। এই উচ্ছেদগুলিতেও হাতেগোনা কিছু মানুষ বাদে বর্ণহিন্দু খুঁজতে

গেলে হতাশ হবেন। আজও উচ্ছেদের নোটিশ পেয়ে গেছে ভদ্রকালী মহিলা ক্যাম্প। সেটিও উদ্বাস্তু দলিতদের দীর্ঘদিনের বাসস্থান। আসলে ২০১১ সালেও স্বদম্ভে চলছে মনুর আইন। শূদ্রের এর বেশি আর কি পাওয়ার আছে?

উন্নয়নের নামে উচ্ছেদের শুরু এখান থেকেই, এরপর বারবারই উচ্ছেদ এসেছে উন্নয়নের বাহানায় রাজারহাট যার এক নিদর্শন। সেই দলিত সংখ্যালঘুদের কৃষি জমি, ভিটে থেকে উচ্ছেদ। তারপর সিঙ্গুর, একমাত্র সিঙ্গুরেই বর্ণহিন্দুরা বেশ কিছুটা ক্ষতির সামনে (সে জন্যই কি সিঙ্গুর নিয়ে এত জলঘোলা? প্রশ্নটা রয়েই যায় কারণ সন্ত্রাসের কথা বললে মরিচঝাঁপি ও রাজারহাট ছিল অনেক নৃশংস)। সেটা হওয়ার কারণ ছিল ঐ অঞ্চল সবচেয়ে উর্বর কৃষিজমি ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নত, ফলে সমাজের মাথা বর্ণহিন্দুদের ঘাঁটি এই বেশি লাভজনক স্থানেই। যদিও ক্ষেতমজুর, ভাগচাষি, অনথিভুক্ত বর্গাদাররা অধিকাংশই দলিত সংখ্যালঘু, ফলে সরকারপ্রদত্ত ক্ষতিপূরণ কিন্তু পেতেন না তাঁরা, পেতো বর্ণহিন্দু জমির মালিকরাই, ফলে ধাক্কা সেই দলিত-সংখ্যালঘুর জীবিকায়। এর সাথে যে যে এলাকার থেকে মানুষ উচ্ছেদের সামনে দাঁড়ালেন, তা সবই দলিত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত, যথা ১) ভাঙড়, ২) বারুইপুর, ৩) নন্দীগ্রাম, ৪) শালবনি, ৫) ডানকুনি, ৬) হরিপুর ইত্যাদি। উচ্ছেদবিরোধী জমিরক্ষার আন্দোলনের উঠে আসা নেতৃত্বের ও শহিদদের নামগুলি দেখলেই বোঝা যায় কারা লড়ছিল, মন্ডল, তাহের, মালিক, ভুল, সোরেন , সেলিম ইত্যাদি। কিছু লোকের জন্য যে উন্নয়ন, তার জন্য বন্দুকের নলে উচ্ছেদ, বন্দুকের নল বহুজন দলিত সংখ্যালঘুর দিকেই ঘোরানো।

এ রাজ্যের বাইরেও ছবিটা আলাদা কিছু নয়। কালাহান্ডি, বিদর্ভের কথা আগেই বলেছি। নয়ডা-গুরগাঁও শিল্পনগরী স্থাপনের জন্যও দলিত সংখ্যালঘুদেরই উচ্ছেদ হতে হয়। নর্মদা বাঁধের ক্ষেত্রেও আলাদা কিছু হয় নি। মুম্বাইয়ের ধারাবিতে ৮৯-৯০ এর উচ্ছেদও একই কথার ধারাবিবরণী। ২০০৫ সালে উড়িষ্যার কলিঙ্গনগরে টাটার কারখানা স্থাপনের নামে আদিবাসীদের উচ্ছেদ করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথাও সবাই জানি আমরা। ঐ রাজ্যেরই পারাদ্বীপের কাছে পস্কো প্রজেক্টের গাজিয়াবাদ সংলগ্ন ঝামেরা খুর্দ

অঞ্চলে দলিত সংখ্যালঘু মানুষদের উচ্ছেদ হতে হয় রিলায়েন্সের কারখানা স্থাপনের জন্য। আজ ঐ রাজ্যের আলিগড়ও একই রকম অবস্থার সম্মুখীন। ভারতে স্পেশাল ইকোনমিক জোন-এর 'রামরাজ্য' গুজরাটে স্থাপিত সবকটিই তৈরি হয়েছে দলিত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলে তাদের উচ্ছেদ করে। ব্রাহ্মণ্যবাদী রাষ্ট্র এবার সাম্রাজ্যবাদী ও দেশীয় পুঁজিপতিদের স্বার্থে চক্রান্ত করেছে বৃহত্তম উচ্ছেদের। যার নাম গ্রিনহান্ট। যা আসলে ছত্তিশগড়, ঝাড়খন্ড, বিহার, উড়িষ্যা, বাংলায় দলিত মানুষদের উচ্ছেদ করে ঐ অঞ্চলের মাটির তলায় থাকা খনিজ লুঠ করার চক্রান্ত। শিকার হতে হবে আবার দলিত জনগণকেই। যা হয়ে আসছে।

আগ্রাসনকারীরা ভূমিপুত্রদের জঙ্গলে নিক্ষেপ করেছে এদেশে। তাঁদের তৈরি দামীন-ই-কো কেড়ে নিয়েছে, সেটা ছিল প্রথম উচ্ছেদ। বিহারের (অধুনা ঝাড়খন্ড) কালিমাটি গ্রামকে উচ্ছেদ করে গড়ে ওঠে জামশেদপুর সেই ১৯২১ সালে। অল্পজন বড়োলোক উচ্চবর্ণের কায়েমি স্বার্থের উন্নয়নের জন্য বারবারই বলি হতে হয়েছে গরিব দলিত সংখ্যালঘু বহুজনকে। কিন্তু এমন উচ্ছেদের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রামে সামিল তাঁরা। আন্দোলনের মাধ্যমেই দেশ জুড়ে তৈরি হয়েছে ব্রাহ্মণ্যবাদী আগ্রাসন বিরোধী যুক্তমোর্চা। এখন প্রয়োজন এই উচ্ছেদবিরোধী সংগ্রামও যে দলিত সংখ্যালঘুর আন্দোলন এই বক্তব্য প্রচার করা। উচ্ছেদকে রুখতে পারাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হলেও তার সাথে ব্রাহ্মণ্যবাদের সামাজিক-রাজনৈতিক-সংস্কৃতিক আগ্রাসনকে প্রতিরোধ করাও যে এই লড়াইয়ের কাজ, সেটাকেও তুলে ধরা দরকার। এবং আমার মনে হয় এই কাজ শ্রেণীসংগ্রামকে সাহায্যই করবে।

এ বিপ্লবের রং সবুজ নয়, ধূসর

অগ্নীশ্বর চক্রবর্তী

১৮ ই জুলাই ২০০৫ দিনটি 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে' অনেক দিন অবধিই একটি কালো দিন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ঐ দিনটি ওয়াশিংটন শহরে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের মধ্যে একগুচ্ছ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তার মধ্যে পরমাণু চুক্তি বা ১২৩ চুক্তি প্রচুর প্রচারের আলো নিজের দিকে টেনে নেওয়ায় বাকি ভয়াবহ চুক্তি গুলির দিকে আমাদের নজর পড়েনি। ঐ সফরে এমন চুক্তিই স্বাক্ষরিত হয় যাতে ভারতবর্ষের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষের জীবনজীবিকা অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। Agricultural Knowledge Inititative (AKI) এই রকমই চুক্তি। চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্যই হল ভারতবর্ষে ' দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব' সংগঠিত করা। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার সময় যৌথ ঘোষণায় মনমোহন সিং একে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের অগ্রদূত বলে ঘোষণা করেন। এর আগে ১৯৬০ দশকে ভারত সরকারের তরফে প্রচুর ঢাকঢোল পিটিয়ে 'খাদ্য সমস্যা' সমাধানের জন্য প্রথম সবুজ বিপ্লবের আয়োজন করা হয়। রেডিওতে প্রচার, ডাক টিকিট তৈরি, জাতীয়তাবাদী আবহাওয়া তৈরি করে প্রায় চল্লিশ বছর ধরে দেশের মানুষকে বোঝান হয় ভারতবর্ষ কৃষিতে প্রভূত উন্নতি করেছে। এরপর এর প্রধান রূপকার ড. স্বামীনাথন যখন কিছুদিন আগে ঘোষণা করেন 'প্রথম সবুজ বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে তাই এই দ্বিতীয় বারের আয়োজন', তখন স্বাভাবিক ভাবেই বেশ কিছু প্রশ্ন জাগে। এই প্রশ্নগুলোর উত্তরও নানান তথ্য থেকে জানতে পারা যাচ্ছে।

প্রথম সবুজ বিপ্লব ও তার ফলাফল ঃ-

ষাটের দশকে ভারতবর্ষের কৃষিনীতিতে একটা পরিবর্তন দেখা যায়। তীব্র খাদ্য সংকটকে বাহানা বানিয়ে ফোর্ড কোম্পানির ফোর্ড ফাউন্ডেশন এবং স্ট্যান্ডার্ড অয়েলের রকফেলার ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে বিশ্বজুড়েই কৃষিকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে অধিকতর শক্তি এবং খনিজ তেল নির্ভর করে গড়ে তোলা হয়। বলা বাহুল্য ভারতবর্ষ সহ আরো বেশ কিছু দেশে তেলের স্থায়ী বাজার তৈরি করাই ছিল এর লক্ষ্য, সাধারণ মানুষের খাদ্য সংকট মোচন নয়।

পেট্রোরসায়ন, কৃষি ব্যবস্থা তৈরির মধ্য দিয়ে নিজেদের সার, আগাছানাশক, বীজ ইত্যাদির বাজার সম্প্রসারণ এবং কৃষি ব্যবস্থায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণ কায়েমই ছিল এর লক্ষ্য। আরেকটু পিছিয়ে গেলে দেখা যাবে ১৯৪৩ সালে মেক্সিকোতে প্রথম সবুজ বিপ্লব করার উদ্যোগ তৈরি হয়, রকফেলার ফাউন্ডেশন, মার্কিন কৃষি দপ্তর আর ইউনাইটেড স্টেট এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (USAID) এর সহযোগিতায়। শুধু কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার নয়, ভূমিসংস্কারও এর আওতায় ছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ষাটের দশকের শেষ অবধি। বিশ্ব জুড়ে কমিউনিষ্ট ভীতি আমেরিকাকে তাড়া করে ফিরছিল। তাই নানান ক্ষেত্রেই জন-বিক্ষোভের উৎস সন্ধান ও বেশ কিছু 'আপাত জন-কল্যাণ' মূলক কাজ তারা দেশে দেশে সরকারকে নিতে বাধ্য করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এদেশের বণিক শ্রেণীর শাসককুল যে ধরনের আমদানি নীতির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পাশ্চাত্যের দেশগুলির মধ্যে ভারসাম্য রেখে দুই দেশের অর্থ ও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করত, তাতে সবুজ বিপ্লবকে জাতীয় কৃষিনীতি হিসাবে গ্রহণ করার কিছু সমস্যা ছিলই। 'সবুজ বিপ্লব' মেনে না নিলে, PL - 480 প্রত্যাহার করা হবে, এই রকম একটা হুমকি মার্কিন রাষ্ট্রপতি জনসন দিয়েছিলেন।

খাদ্য সংকটের সুযোগ নিয়ে ঢুকে পড়ে। প্রথমেই ভারতবর্ষের জমির উর্বরতা পরীক্ষা করা হয় প্রচুর দামি যন্ত্রপাতির মাধ্যমে। নেওয়া হয় সার উৎপাদনের প্রযুক্তি, উচ্চ ফলনশীল বীজ। খাদ্যের উৎপাদনও বেড়েছিল খানিক। ১৯৫০-৫৫ এ যেখানে মাথা পিছু গড় খাদ্যের যোগান ছিল ১৫২ কেজি (ক্রয় ক্ষমতা অনুযায়ী নয়, লভ্যতার পরিমাণ হিসাবে) সেখানে ১৯৮০ তে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৭৭ কেজিতে। জনিয়ে রাখি এখন তা (২০০৮-০৯) ১৩৭ কেজি, যা যে কোন দুর্ভিক্ষের অবস্থার চেয়েও খারাপ।

প্রথম সবুজ বিপ্লবের প্রধান তিনটি বিষয় ছিল ঃ-

১। আরো বেশি জমিকে কৃষির আওতায় নিয়ে আসা।

২। জমিকে দু-ফসলি বা তিন ফসলি করে তোলা।

৩। উচ্চ ফলনশীল বীজের চাষ করা।

বোঝাই যায় কৃষি বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এমন একটি মানুষও প্রথম দুটি ব্যাপার বোঝে। তাতে মার্কিন বিশেষজ্ঞদের মতামত লাগবে কেন কে জানে? আর তৃতীয় বিষয়টি তো স্পষ্টতই বীজের বাজারে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই সময়ই ১৯৬৭ সালে, উলফ ল্যাডজেনস্কি ভারতবর্ষে ভূমিসংস্কার কর্মসূচী রূপায়ণ করার জন্য পাকাপাকি ভাবে দায়িত্ব পান। ভদ্রলোক বিভিন্ন সময়ে মার্কিন রাষ্ট্রপতিদের উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেছেন। এবং ভিয়েতনাম, জাপান ইত্যাদি দেশে সফলভাবে রাষ্ট্রের তরফে উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া ভূমিসংস্কার কর্মসূচী রূপায়ণ করেছেনবিশ্বজুড়ে কমিউনিজিম এর প্রভাবকে আটকাতে। গড়িয়াহাটের মোড়ে বিরাট বড় করে ফ্লেক্স টাঙিয়ে জানানো হয়েছে এখন অবধি এ রাজ্যে ১১.২৮ লক্ষ একর জমি ভূমিসংস্কার করা হয়েছে। রাজ্যে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ১৪৩ লক্ষ একর। অর্থাৎ মাত্র ৭.৮ শতাংশ, এই নিয়েই চলল ৩৫ বছরের প্রচার? এর মধ্যে আবার ৩.৭৫ লক্ষ একর হয়েছে কংগ্রেস জমানায়, ২.৫ লক্ষ একর যুক্তফ্রন্টের আমলে। যাই হোক ধরলাম একটা বিরাট ব্যাপার যদিও তা কখনোই লেনিনীয় পদ্ধতিতে নয়, যা লেনিন দেখিয়েছিলেন Agararian programme of social democracy in first Russian revolutin প্রবন্ধে (L.C.W Vol. 13, P-238-40)। যাই হোক ঢাক ঢোল পিটিয়ে প্রচুর ব্যবস্থা তো নেওয়া হল। ফল কী? 'বিপ্লবের' আঁতুড় ঘর পাঞ্জাবে কৃষিজীবী মানুষের মাথাপিছু গড় ঋণ ৪২ হাজার টাকা। মোট দেনার পরিমাণ ২৫ হাজার কোটি টাকা। রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে, রাজ্যের অধিকাংশ জেলায় মাটি, জলাধার, খাবারে বিষ। প্রত্যেকদিন রাত্রে পাঞ্জাবের ভাটিন্ডা থেকে বিকানির পর্যন্ত যায় একটি ট্রেন, ৩৩৯ নং ট্রেন। গন্তব্য আচার্য তুলসী ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টার, পুরো ট্রেনটায় ভর্তি ক্যান্সার রোগী। কৃষিজীবী মানুষের প্রতি দশজনে ৩ জন ক্যান্সারে আক্রান্ত। যাই হোক এরপর কর্তাব্যক্তিরা ঘোষণা করলেন ব্যর্থ হয়েছে প্রথম সবুজ বিপ্লব। যে বিপ্লব দিয়েছে একটা ক্যান্সার বেল্ট। যে বিপ্লবের জন্য তৈরি হয়েছিল ভুপালে ইউনিয়ন কার্বাইড-এর কারখানা এবং তার গণহত্যার ইতিহাস। অবশ্য এই নীতির পিছনে ভারতের নিজস্ব কোন পরিকল্পনা ছিল না, ছিল হাত পেতে ভিক্ষে নেবার শর্ত। আর তার জন্যই বন্ধক হয়েছিল জল, জমি, জনস্বাস্থ্য।

দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব :-

প্রথমটা ব্যর্থ তাই দ্বিতীয় বারের প্রয়োজন। আরো বেশি সবুজ (নাকি আরো বেশি রক্তে লাল, কে জানে?)। এবার কতকগুলো সুনির্দিষ্ট প্রচার আছে। কৃষি আর লাভজনক নয়, ফলে জমি বেচে দাও জমির হাঙরদের কাছে। কি করেই বা লাভজনক হবে? রাসায়নিক সার উৎপন্ন হবার পর ব্যবহৃত হতে তাকে গড়ে ৮৩৭ কিলোমিটার ভ্রমণ করতে হয়। প্রত্যেক দিন জলস্তর নেমে যাচ্ছে আমাদের রাজ্য সহ গোটা ভারতবর্ষের। কৃষিতে ভর্তুকি কমাচ্ছে সরকার। আর কৃষিতে ঢুকে পড়ছে বড়ো বড়ো কর্পোরেটগুলো, যাদের অনেকের বার্ষিক আয় দেশের জাতীয় আয় এর চেয়েও বেশি। ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষের নানা অংশে চুক্তি চাষের মধ্য দিয়ে বহুজাতিক সংস্থা দেশী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে নেমে পড়েছে। ওয়ালমার্টের সাথে মিত্তলদের ভারতী। টাটার কিয়ানের সাথে ব্রিটেনের টেস্কো। কিছুদিন আগে আমাদের রাজ্যেও মেট্রো ক্যাস এন্ড ক্যারিকে লাইসেন্স দিয়েছে রাজ্য সরকার। একদিকে তারা যেমন ভিতরের বাজার দখল করতে চায়, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গকে খাদ্য ভান্ডার হিসাবেও ব্যবহার করতে চায়। বীজের বাজারে মনসান্টো, দুঁপো এবং মিনজান ৪৭ শতাংশ বীজের মালিকানা দখল করে রেখেছে। ১০টি কীটনাশক কোম্পানি ৮ শতাংশ বীজের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে। AKI চুক্তির মাধ্যমে দেশের কৃষি নীতির দেখভাল করবে আমেরিকার কৃষিদপ্তর ও কিছু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। ITC -এর চুক্তিচাষের খসড়া বানিয়েছে আমেরিকার মিশিগান বিজনেস স্কুল। সাউথ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট মনসান্টোর ডিরেক্টর বোর্ডের সভা হয়েছেন। চুক্তি প্রাথমিক ভাবে বেছে নিয়েছে চারটি ক্ষেত্র - ১) শিক্ষা, পাঠ্যতালিকা নির্বাচন, গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ, ২) খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও জৈব জ্বালানির ব্যবহার, ৩) জৈব প্রযুক্তি, ৪) কৃষিতে জল সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। এবং এই চুক্তি রূপায়িত হবে পিপিপি মডেলে যার অর্থ প্রাইভেট-পাবলিক- পার্টনারশিপ। মানে পরিকাঠামোর খরচ যোগাবে সরকার আর মুনাফা যাবে বহুজাতিকের ঘরে।

দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের মূল কথাই হল জিন প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি। ভারতে জিন ফসলের চাষ শুরু হয় B.T. তুলো দিয়ে। অতিরিক্ত মুনাফার লোভ দেখিয়ে মহারাষ্ট্র, কর্নাটক, অন্ধ্রপ্রদেশের ঘরে ঘরে গিয়ে বোঝানো

হয়েছিল, এই চাষে বেশী ফলন হবে। ফল? কৃষকের মৃত্যু মিছিল। বলা হয়েছিল কীটনাশকের ব্যবহার কমবে। মিথ্যা কথা। তা বেড়েছে আর বীজের দাম আকাশ ছোঁয়া। বহু জায়গায় পোকার উপদ্রবে কৃষকেরা নিজেদের জমিতে আগুন দিয়েছেন। ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরোর রেকর্ড থেকে জানা যাচ্ছে ভারতে ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত দেশে ১ লক্ষ ৯৯ হাজার ১৩২ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। অর্থাৎ প্রতি ২৭ মিনিটে একজন। কিছুদিন আগে বিটি বেগুন নিয়ে সারাদেশ উত্তাল হয়ে উঠেছিল। প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়ে আপাতত এই বিটি বেগুনকে বাজারে আনা হবে না বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু নানান দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারির খবর এর মধ্যে প্রকাশিত। যে বিশেষজ্ঞ কমিটি একে ছাড়পত্র দেবার দায়িত্বে ছিলেন তাদের অধিকাংশই মনসান্টোর বিশেষ অনুদানপ্রাপ্ত। এর পরেও দেশের সায়েন্স অ্যাকাডেমির তরফ থেকে যে রিপোর্ট দেওয়া হয় তাতেও কোন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, তথ্যসূচী বা তথ্যপঞ্জিকা দেওয়া হয়নি। এর আগে মনসান্টোর বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ায় ১৪০ জন আধিকারিককে ৭ লক্ষ ডলার ঘুষ দেবার অভিযোগ রয়েছে। এখন আবার আমাদের রাজ্যেও চুঁচুড়া ধান গবেষণা কেন্দ্রে রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে শুরু হয়েছে - জিন পরিবর্তিত চালের চাষ যাতে সাধারণ সুরক্ষামূলক বিধিগুলোও মানা হচ্ছে না।

সত্যিই খাদ্য একটা অস্ত্র। যাকে হাতিয়ার করে গরীব দেশের লোভী দালাল নেতাদের মদতে সাম্রাজ্যবাদ ঢুকে পড়ছে দ্রুত গতিতে। তৈরি হয়েছে নতুন বীজ আইন। ২০০৪ সালে এই বিল রাজ্য সভায় পেশ হয়। তারপর নানান কারণে আটকে থাকলেও কিছুদিনের মধ্যেই পাশ হয়ে যাবে তা সবাই আশংকা করছে। কেউ বীজ নিয়ে ব্যবসা করতে পারবে না। অনভিযুক্ত কোন বীজ নিয়ে চাষও করা যাবে না। এর জন্য তৈরি হবে নজরদারি সমিতি পাশাপাশি মনসানোটা, সিনজেন্টা তৈরী করবে এমন বীজ যা একবার জমিতে ব্যবহার করলে বারবার ব্যবহার না করে উপায় নেই।

আশ্চর্য হলেও সত্যি, যে ২০০০ সাল থেকেই পশ্চিমবঙ্গে ' দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব' -এর কাজ শুরু হয়ে গেছে মার্কিন ম্যাকিনজের সুপারিশ মেনে। ২০০০ সালেই এ রাজ্যে যে কৃষিনীতি নেওয়া হয় তার সাথে ২০০৫ সালে চুক্তির পর যে কৃষিনীতি নেওয়া হয় তার কোন ফারাক নেই। এই কৃষিনীতি অনুযায়ী

পশ্চিমবঙ্গকে চারভাগে ভাগ করে নিয়ে, চলবে রপ্তানি যোগ্য বাণিজ্যিক ফসলের চাষ। ফলত বোঝাই যাচ্ছে পরিকল্পনাটা অনেক গভীর এবং সুনির্দিষ্ট।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রথম ৫৩ বছরে মাত্র তিনজন মার্কিন রাষ্ট্রপতি এদেশে এসেছেন। আইজেনহাওয়ার (১৯৫৯), নিক্সন(১৯৬৯), আর জিমি কার্টার (১৯৭৯), আর গত দশ বছরে তিনজন ক্লিন্টন (২০০০), বুশ (২০০৫) আর সম্প্রতি বারাক ওবামা। তহেলকা পত্রিকা ১৩ নভেম্বর ২০১০ সংখ্যায় প্রকাশ কারাত বলেছেন ' আমরা কোনদিনই বিদেশী পুঁজির বিরুদ্ধে নই, তবে কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ প্রয়োজন তা ঠিক করতে হবে।'

কোন পথে সমাধান তা আমার মত এক ছাত্রের পক্ষে বলা খুব দুরূহ। তবে সংগঠিত হবার প্রয়োজন খুবই। কারণ এই ব্যবস্থায় সব থেকে শোষিত হয়,শ্রমিক, ভূমিহীন কৃষক সহ মেহনতী আমজনতা। লক্ষ করলে দেখা যাবে তাদের প্রায় পুরোটা আবার তফসিলি জাতি, উপজাতি বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ।

ত্বকের যত্ন নিন

অনন্ত আচার্য

কোনও গান, সাবান বা ওষুধের প্রচার নয়; ত্বক চর্চা প্রবন্ধের বিষয়ও নয়। মূল বিষয়ে প্রবেশপথের সাথী মাত্র। কোনও সুস্থ বয়স্ক মানুষ নিজের ত্বক পরিষ্কারের দায়িত্ব নিজে নেবেন — এটাই স্বাভাবিক। যদি দেখা যায় — দু'জন সুস্থ বয়স্ক মানুষ প্রকাশ্যে সাবান হাতে পরস্পরের শরীরের চামড়া সফেদের কাজে নেমে পড়েছেন — তা কাম্য নয়, দৃষ্টিনন্দনও নয়।

মূল বিষয়ে আসা যাক। ভারতে নিরীশ্বরবাদী, না-ধার্মিক, হেতুবাদী, ঘোষিত-অঘোষিত-স্বঘোষিত সেক্যুলার মানুষের সংখ্যা প্রতি শতে প্রায় ২০ জন। এদেশে যেহেতু হিন্দুরা সংখ্যাধিক (আদিবাসীদেরও যখন হিন্দু হিসাবেই গণনা করা হয়), ফলে উপরোক্ত ২০ শতাংশের অধিকাংশই হিন্দু পরিবার জাত। অবশ্য এই সংখ্যাতত্ত্বকে অনেকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণে দেখেন। গর্বসে কহো হাম্ হিন্দু হ্যায়—স্লোগানদাতারা তো বটেই, অনেক হিন্দু পরিবার জাত সেক্যুলার মুক্তমনা মনে করেন যে সংখ্যালঘু শ্রেণির (বিশেষত মুসলিম সম্প্রদায়) মানুষের মধ্যে কুসংস্কার মুক্তির প্রচেষ্টা ও সম্ভাবনা দুর্বল। সিংঘল—আদবানিরা কর্কশ ভাষায় একথা বলেন, প্রগতিবাদীরা বলেন শালীন ভাষায়—মর্মবস্তুতে খুব একটা ফারাক থাকে না। ভাবনার দুনিয়ায় এও এক ধরণের আধিপত্যবাদ-সংখ্যাগুরুর আধিপত্যবাদ, যে রোগে সেক্যুলাররাও আক্রান্ত হন অনেক সময়।

কার্যাশ্রম ব্যবস্থার জীবাণু মাথায় থাকলে যেমন ভাবা হয় যে বামুনের ছেলে তো লেখাপড়া শিখবেই, ডোম-মুচির ছেলে পড়াশুনার খুব বেশি এগোবে না বা পুরুষতান্ত্রিকতা যেমন "মেয়েরা একটু কম বোঝে কম জানে" ধরণের ধারণা সমাজে ছড়িয়ে দেয়। দক্ষিণ মধ্য বাম যে গ্রহের বাসিন্দাই হোন না কেন যদি মাথায় থাকে যে এদেশে রেনেসাঁস সফল হয়েছে—হিন্দু সমাজে সংস্কারকগণ সমাজটাকে আধুনিক আলোকপ্রাপ্ত করে তুলেছেন—গোড়ায় গলদ এখানেই জন্মায়। একথা পরিষ্কারভাবে বোঝা দরকার যে কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মই আমাদের আধুনিক, আলোকোজ্জ্বল, মানবিক দুনিয়ায় নিয়ে যেতে পারবে না। সব ধর্মই তার শৈশবকালে বেড়ে উঠেছে পীড়িতের আর্তনাদ, অসহায়ের দীর্ঘশ্বাস, যুক্তিহীন আবেগ নিয়ে। সময়ের সন্ধিকালে রাষ্ট্রীয় নির্দেশে তা হয়ে

দাঁড়ায় জীবনঘাতী নেশার দ্রব্য। ভারতে হিন্দুত্ববাদ এমনই সংক্রামক যে তা কখনো দমনকারীর হাত ধরে, কখনো বা সেক্যুলার ভেকধারী উপদেষ্টার হাত ধরে সমাজ সফেদের দায়িত্ব নিয়ে নেয়। ফল হয় মারাত্মক। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তার "ঘেটো কমপ্লেক্স" থেকে না বেরিয়ে থেকে যেতে চায় বদ্ধজলায়। অন্ধকার ঘরে আটকে থেকে তারা প্রান্তিক বা খন্ডিত সংস্কৃতির মধ্যে খোঁজে তার আত্মপরিচয়। অবাস্তব সুখস্বপ্নে (প্রকৃতপক্ষে অসুখ) তার দৈনন্দিন যন্ত্রণা থেকে মুক্তিপথ খোঁজে।

"বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য" বাক্যটি যতবার ব্যবহৃত হয়েছে তার লক্ষ ভাগের একভাগও বাস্তবে প্রয়োগ হয়নি। ভারতীয় সেক্যুলারদের বৃহদাংশের সমস্যা এই যে তারা যখন ঐক্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন তখন বৈচিত্রের কথা মাথায় রাখেননি বা যখন বৈচিত্রকে প্রাধান্য দিয়েছেন তখন ঐক্য বাতিল। এর কুফল এই যে ইউনিফর্ম সিভিল কোডের দাবির সময় এই সেক্যুলাররা মানেই রাখেন না যে জনসংখ্যা বহুকাল যাবৎ একই কথা ভিন্ন ভাষায় বলে আসছে।

সারা পৃথিবীর মুসলমানরা ধর্মীয় বিধানের প্রাচীন জালে আটকে আছেন—এটা বাস্তব ছবি নয়, আংশিক প্রতিফলন মাত্র। মুতাজ্জেলাবাদীরা যে জিজ্ঞাসু মানসিকতার দরওয়াজা খুলেছেন ১৩০০ বছর আগে তা আজও হাজার ঘাত-প্রতিঘাতে বন্ধ হয়নি। মুসলিম প্রধান দেশগুলোর সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, সমাজনীতির তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ করলে পরিষ্কার বোঝা যায় সেই সব দেশগুলোর বেশিরভাগ মানুষের জীবনচর্চা শাস্ত্রীয়বিধান নির্দেশিত পথে নয়। উপরন্তু সময়, অঞ্চল-বৈশিষ্ট্য তাদের ইতিবাচক পথে নিয়ে যাচ্ছে। পৌত্তলিকতা বিরোধিতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে খলিফাদের নির্দেশে ছবি তোলা, ছবি আঁকা, ছবি দেখা নিষিদ্ধ। আজ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়া মুসলমানরা ভিনদেশ ভ্রমণ এমনকি হজ যাত্রার প্রয়োজনে পাসপোর্টে ছবি লাগানোর মত অধর্মীয় কাজে দ্বিধা করেন না। ইসলামী শাস্ত্রীয় বিধানে যেহেতু সুদ দেওয়া বা নেওয়া আপত্তিকর ফলে মুসলিম প্রধান দেশে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা চালু থাকার কথা নয়। কিন্তু বাস্তব অবস্থা বিপরীত। বুখারী হাদিশে বাদ্য, সঙ্গীত চর্চা নিষিদ্ধ। অথচ সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত সঙ্গীত বাদ্যযন্ত্র শিল্পীদের ১০০ জনের ৩০ জন মুসলমান। সময় সব ধর্মীয় সম্প্রদায়কে পরিবর্তনমুখী করে তুলেছে, বাস্তব জীবনের চাহিদা-জিজ্ঞাসু মন সব ধর্ম শাস্ত্রকে সংশয়ের চোখে দেখতে শেখাচ্ছে। শাস্ত্রীয় বিধান অগ্রাহ্য করার ঠিকাদারী কি কেবলমাত্র (হিন্দু) সেক্যুলাররা নিয়েছেন? তবে কেন এই স্ব-মৈথুন বিলাস?

বাঙালীর মহোত্তম উৎসব দুর্গাপূজা — এই ভুল প্রচারে এদেশের সেক্যুলারকুলে হেলদোল নেই। সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পূজায় আপত্তিকারী প্রধান শিক্ষিকা সাস্পেন্ডেড হলে এই সেক্যুলারকুল নিস্পৃহ থাকেন। যে সেক্যুলার স্বাধীন চিন্তার দাবীদাররা ভারতে বার্ট্রান্ড রাসেলের বই নিষিদ্ধ হলে কথা বলেন না, অমূল্য সেনের "চৈতন্যচরিত" বইটি বেআইনি হলে অরব থাকেন, গোলাম আহমেদ মোতজিার রচনা "চেপে রাখা ইতিহাস" সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখেন না তারাই আবার শুধুমাত্র শাহবানু মামলা বা বিতর্ক তথা বাণিজ্যপ্রেমী কোন লেখক-লেখিকাকে নিয়ে মেতে ওঠেন।

মধু লিমায়ে লিখেছিলেন — "Reform must come from within"। সুপরিচিত সমাজ গবেষক শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় — দেশে দাঙ্গা যত বাড়বে, আজানের আওয়াজ ততই বেসুরো শোনাবে। কোনও রুক্ষতা নয়, স্যানীটারী ইন্সপেক্টরের কাজের ধারায় নয়, সংবেদনশীলতা দিয়ে, ধৈর্য্য ও বুদ্ধির মিশ্রণ ঘটিয়ে পুরোহিততন্ত্র মোল্লাতন্ত্রকে নির্মূল করতে হবে। বেগম রোকেয়া, আব্দুল ওদুদ, আরজ আলি মাতুব্বর, আহমদ শরীফের কর্মকান্ড ফলপ্রসূ হয়নি — এ ধরণের হতাশার কোন জায়গা নেই। বিদ্যাসাগর, রামমোহনের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও হিন্দু সমাজের অচলায়তন কার্যত না-পরিবর্তিত থেকেছে। একটি সবুজ-সতেজ ঘাসে ভরা মাঠের কোন অংশ যদি কিছুদিন আচ্ছাদনে ঢাকা থাকে, আলো জল না পায় — সেই অংশের ঘাস তুলনামূলকভাবে কম সবুজ কম সতেজ হবে, সেটাই স্বাভাবিক। এই আচ্ছাদন না সরালে মাঠের সমস্ত অংশই সমান সতেজ সবুজ আশা করাটা মূর্খামি। ভারতের মাটিতে এই আচ্ছাদন উচ্চবর্ণ হিন্দুত্ববাদ, সারা পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে খৃষ্টীয় মৌলবাদের হাত ধরা সাম্রাজ্যবাদ। অপরপ্রান্তে আধিপত্যবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিশ্বজনতা, যার একাংশ এই সময়ে ঘটনাচক্রে "ইসলামী মিলিট্যান্ট"। সারা পৃথিবীর নতুন এই সমীকরণ না বুঝলে জেহাদ, যার প্রকৃত অর্থ ন্যায়যুদ্ধ, কার্যত ধর্মযুদ্ধে পরিণত হবে এবং ফলতঃ মারাত্মক চেহারা নেবে।